ছক ও ছবি

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য



মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—দুই টাকা বারো আনা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও সি. সি. রায় চৌধুরী কর্তৃক জগৎ প্রিণ্টার্স,
(প্রাঃ) লিঃ, ১০৩, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীপরিমল গোস্বামী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

'ছক ও ছবি' কাল্পনিক কাহিনী নয়, জ্যোতিষীর অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি। 'প্রায় গল্প' আখ্যা নিয়ে দৈনিক 'যুগান্তর পত্রিকা'র সাময়িকী বিভাগে প্রায় সবগুলিই প্রকাশিত হয়েছে। ছোট গল্পের পর্যায়ে এগুলি পড়ে কি না সে বিষয়ে সংশয় থাকলেও আমাদের দৈবনির্ভরশীল সমাজমানসের চিত্ররূপে গল্পগুলির নিশ্চয়ই মূল্য আছে। তাই জ্যোতিষীর রোজ নামচায় যে চরিত্রগুলি দাগ কেটে গেছে, তাদেরই কয়েকটি বিচিত্রকাহিনী এই গ্রন্থে পরিবেশন করেছি।

'মিত্র ও ঘোষে'র কর্তৃপক্ষ বন্ধুদ্বয় শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীসুমথনাথ ঘোষ উভয়েই প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক। তাঁদেরই আগ্রহ ও প্রেরণা 'ছক ও ছবি'-কে রূপ দিতে সহায়তা করেছে। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ শ্রীহারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

ছক ও ছবি

"বড় ভাবিয়ে তুললেন আপনি। আচ্ছা, আসি নমস্কার।"

উতলা তাঁর মন, ভারাক্রান্ত তাঁর পদক্ষেপ; মুখ চোখ তখনও প্রশ্নাতুর। বারবার মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকান; তাঁর সন্দেহের নিরসন এখনও হয় নি কিংবা নূতন ভাবে কোন আশার সঞ্চার হয়েছে, কিছুই বুঝা গেল না।

জ্যোতিষীর জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যার ছাপ অনেক দিন পর্যন্ত মনের উপর থেকে যায়; এমনি একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল; অদ্ভুত এক নারী, আর অভিনব আমার অভিজ্ঞতা!

প্রায় তিন ঘণ্টা তাঁহাতে আর আমাতে আলোচনা চলেছে; বিরক্তি বোধ হ'লেও এ অভূতপূর্ব ঘটনায় আমার কৌতূহল বেড়েই উঠেছিল।

অভূতপূর্বই বটে; ছবি আর ছক;—ছবি মানে ফটো। একখানি নয় বা একজনের নয়, পাঁচজনের। আর ছক,—পাশা কিংবা দাবার নহে; দুজনে মিলে এতক্ষণ পাশা কিংবা দাবা খেলায় মত্ত ছিলাম না। কোষ্ঠীর ছক আমার সামনে।

স্বয়ম্বর সভা বসে গিয়েছিল; পাঁচটি অশরীরী আত্মা সম্ভবত অদৃশ্যে লুকায়িত থেকে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। হয়ত আমার সামনেকার ছকের দিকে কিংবা আগন্তুক মহিলার দিকে

উৎসুক ব্যগ্র নয়নে তাঁরা তাকিয়ে রয়েছিলেন। আমি বিচারক; কোষ্ঠীর ছক নিয়ে বিচার করছিলাম।

শুধু সুখ দুঃখ কিংবা ভাগ্যের বিচার নহে; এ ছকের সঙ্গে এক এক করে পাঁচখানি ছবির আসল সত্তা যাঁরা, আর এ ছক-খানি যাঁর, তাঁর মিলন হতে পারে কি না দেখছিলাম; অর্থাৎ সোজা কথায় যোটক বিচার করছিলাম।

কোন জ্যোতিষী এরূপ অভূতপূর্ব অভিনব সমস্যার সম্মুখীন কখনও হয়েছেন কিনা জানি নে; কিন্তু আমাকে এরূপ অভিনব সমস্যার সমাধানও করতে হয়েছিল। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। মহিলাটি চলে গেলেন।

আমারও মন ভারাক্রান্ত হ'ল। মহিলাটি সত্যই দারুণ সমস্যায় পড়েছেন। আমি ত নির্দেশ দিয়েই খালাস; কিন্তু এ পঞ্চভূতের দ্বন্দ্বে তাঁর জীবন যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে; ইহার একটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নিস্তার নেই। এড়িয়ে যাবারও উপায় নেই; তারুণ্য ডুবে গেলেও এখনও লাবণ্য উঁকি ঝুঁকি মারছে; তাঁর একটা নিশ্চিত নির্ভরের দরকার। উদ্‌গ্রীব তাঁর মন; অবলম্বন একটা চাই যে।

বয়স তাঁর অনুমান করা শক্ত; গোলাপী রেণু-রাগ রঞ্জিত গায়ের রঙ ঠিক করা ততোধিক শক্ত। বয়স ত্রিশের ঊর্ধ্বে বলেই মনে হল। কথায়-বার্তায়, আলাপ-আলোচনায় কিংবা রসিকতায় একটুও সংকোচ নেই তাঁর। তাঁর মুখে কোন আগল না থাকলেও নিতান্ত সহজ ও ভদ্র তাঁর আচরণ। মহিলাসুলভ সংকোচ তাঁর মোটেই নেই। অথচ তাঁর উচ্ছল

কথাবার্তায় পুরুষের পক্ষে তাল রেখে চলা হয় কঠিন; বরং পুরুষের মধ্যেই দেখা দেয় একটা সংকোচের ভাব। মেয়েদের এরূপ আলাপ আচরণ পুরুষের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ঠেকবে।

কথাবার্তায় রহস্যজাল সৃষ্টি করে তিনি আমাকে বিস্মিত করে তুলেছিলেন। পূর্বপরিচিতি মোটেই নেই; আজ নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই তিনি এসেছেন।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছবি ও ছক বের করে তিনি টেবিলের উপর রাখলেন। এক এক করে পাঁচখানি ছবি তিনিই সাজালেন; তার পাশে রাখলেন কোষ্ঠীর ছক।

তিনি বললেন, "বিচার করে বলুন, এই ছকটার সঙ্গে কার বেশী মিল হতে পারে?"

ব্যাপার দেখে আমি ত হতভম্ব। আমার সম্মুখস্থ টেবিলে প্রসারিত পাঁচখানি ছবির দিকে একবার, আর মহিলাটির মুখের দিকে এক একবার তাকাই; বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কি করতে হবে, বুঝতে পারছি নে।"

তিনি মৃদু হেসে উত্তর দেন, "যোটক বিচার। এঁদের কারো ছক নেই; জন্মের সাল তারিখ জানবারও উপায় নেই; এঁদের ছবি থেকেই যোটক বিচার করতে হবে।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "ছবির সঙ্গে যোটক-বিচার করতে হবে? এঁদের গুণাগুণ বা পরিচয় নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে?"

তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই। আজই একটা হেস্তনেস্ত করতে

চাই। মনে রাখবেন, আপনার কথার উপর একটা মেয়ের, না, না, একটা জীবনের সব কিছু নির্ভর করছে।"

আমি ছবিগুলোর উপর চোখ বুলাতে লাগলাম। সম্পূর্ণ নূতন এই অভিজ্ঞতা! একবার ছবির দিকে তাকাই, আবার তাকাই ছকের দিকে।

তরুণী মহিলা বললেন, "এঁদের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠেছে। হয়ত বুঝতে পারবেন না আপনি; নারীর জীবনের পথে পুরুষেরা যেমন প্রধান সহায়, তেমনি আবার কাঁটাও বটে!"

ঔৎসুক্যের সঙ্গে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন; আমি ছবিগুলো পরীক্ষা করতে লাগলাম।

প্রথম ছবিখানায় মেয়েলি ভাবের আভাস ফুটে উঠেছে; লম্বা নাসা, টানাটানা চোখ, চুলগুলো রাবীন্দ্রিক ধরনের। দৃষ্টিতে কেমন আহা-মরি ভাব! চেহারায় ইণ্ডিয়ান আর্টের বককঙ্কাল ভাব যেন ত্রিভঙ্গ সৃষ্টি করেছে। নিজেকে কবি, গায়ক কিংবা চিত্রকর রূপে জাহির করবার একটা চেষ্টা রয়েছে বলে মনে হয়।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ইনি কে? নিশ্চয়ই কোন শিল্পী কিংবা কবি!"

তিনি উত্তর দিলেন, "ঠিকই ধরেছেন; ইনি একজন শিল্পী; মানে চিত্রশিল্পী; সঙ্গীতজ্ঞও বলতে পারেন; কিন্তু চিত্রকলায়ই তাঁর বেশী খ্যাতি। ছবি অবশ্য বেশী আঁকেন না; সেবার পূজো সংখ্যায় 'ভীমপলশ্রী'র যে ছবি বাজারে চমক লাগিয়েছিল, সে ছবি ছিল এঁরই অথচ ছবি আঁকা তাঁর পেশা নয়।"

এবার দ্বিতীয় ছবিখানি দেখতে লাগলাম। মুখখানি বেশ গম্ভীর; কিন্তু চোখের দৃষ্টি একটু কুটিল; চতুরতার ভাব বা কুটবুদ্ধির আভাস তাঁর মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট ছাপ রেখেছে। নাসার মধ্য ভাগ যেন বসে গেছে; মাথায় সুবিশাল টাক। পোশাক পরিচ্ছদে সাহেবিয়ানা রয়েছে; নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যেন ইনি বিশেষ সচেতন। শুনলাম, ইনি একজন বার-য়্যাট-ল।

মহিলাটি বললেন, "এদের মধ্যে ইনিই বেশী স্মার্ট; পসারও মন্দ নয়। ওজন মাফিক কথা বলেন; অন্যদের তিনি তাচ্ছিল্য করেই চলেন। এদেশটা তাঁর ভাল লাগে না; এদেশের প্রত্যেক জিনিসই তাঁর মনে পীড়া দেয়; দেশের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-আচরণ তাঁর মোটেই সহ্য হয় না। এদেশে নাকি তাঁর শরীরও ভাল যাচ্ছে না।"

আমি উত্তর দিলাম, "তা না থাকারই কথা! অথচ এদেশেই তাঁকে থাকতে হবে! অদৃষ্টের কি নির্মম উপহাস!"

তৃতীয় ছবিখানির দিকে এবার দৃষ্টি ফিরালাম। মাথার চুল ছোট ছোট; দেহখানি মজবুত ও পেশীবহুল ব'লেই মনে হ'ল। শুনলাম, ইনি কণ্ট্রাক্টার অর্থাৎ চুক্তিতে কাজ করেন; অর্ডার মাফিক সাপ্লাইও করে থাকেন—কয়লা, কাঠ, সিমেণ্ট, চাল আরো কত কি! চেহারায়ও কাঠখোট্টা ভাব! কংগ্রেসী কংগ্রেসী বলে মনে হয়।

মহিলাটি বললেন, 'ইনি একজন সুদক্ষ কর্মীও।'

শুনলাম লীগের আমলে দেশবিভাগের পূর্বে চালের

কারবার করে তিনি বেশ কিছু করে নিয়েছেন। আর এখন ত ভাবনাই নেই, নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে রাজত্ব এসে গেছে কি না ?

মহিলাটি বলতে লাগলেন, "ধরুন, ওঁর ইউনিভার্সিটীর এডুকেশন বিশেষ না থাকলেও আর্থিকক্ষেত্রে যোগ্যতা অনেকখানি আছে। দেশের জন্য খেটে খেটে লেখাপড়া করবার সময়ও বিশেষ পান নি। ইনি আশা করেন, আগামী ইলেকশনে দাঁড়িয়ে একটা কিছু সুবিধা করে নেবেন।"

আমি হেসে উত্তর দেই, "নিশ্চয়ই ততদিনে নিজের কাজও গুছিয়ে নেবেন। ঝকমারি ব্যবসা আর করতে হবে না। তাতেও লাভলোকসান খতিয়ে দেখতে হয়, লাভ হলেও খরচপত্র করতে হয় ; তার উপর খাতাপত্র রাখা—।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—প্রায়ই বলেন, ইন্‌কামট্যাক্স আর সেল ট্যাক্সের জ্বালায় ব্যবসার গুড়ে বালি পড়ে গেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন না ; খাতাপত্র দেখিয়েও লাভ নেই ; বিশ্বাসই করে না, খাতিরও করে না ; যা খুশী তাদের চাপিয়ে দেয়।"—তিনি উচ্চ-হাস্যে কথাগুলি শেষ করলেন।

আমিও বললাম, "সত্যি কথা ! এতে খদ্দর ভদ্দর কিছুই বিচার নেই। আমি এক ভদ্রলোকের কথা জানি ; পাকিস্তান থেকে তিনি উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন ; বস্তিতে দুখানা ঘর নিয়ে তিনি বাস করছেন ; চাকুরী জুটে না ; তাই জ্বালানি কাঠ বেচে সংসার চালান। কাঠ চিরে স্তূপাকার করে রেখেছেন একটা জায়গায় ; খোলার ঘরে তিনি থাকেন ; ঘরের সামনে সাইনবোর্ড

মেরেছেন—"জ্বালানী কাঠের কারখানা"। আর যায় কোথা? কর্পোরেশনের লোক এসে ট্রেড লাইসেন্স নিতে বাধ্য করেছে। তারপর ছ'মাস যেতে না যেতে সেলট্যাক্স ও ইনকাম ট্যাক্সের লোক এসে হাজির! ইতিমধ্যে তার কারখানা ফ্যাক্টরী আইনে পড়ে কি না দেখবার জন্য ইন্সপেক্টারও দেখে গেছে। দেখুন দেখি কি ফ্যাসাদ!"

মহিলাটি বললেন, "যত সব বোগাস্! ওদের মাথা বিগড়ে গেছে। কেবল ট্যাক্স আর ট্যাক্স!"

আমি বললাম, "এটাও বাতিল"।

চতুর্থ ছবিখানি বেশ নাদুস-নুদুস অথচ লম্বা-চওড়া চেহারার আভাস দেয়। পাঞ্জাবীর উপর জহর কোট—মুখে চাপা হাসি।

মহিলাটি পরিচয় দিলেন, "বেশ আপ-টু-ডেট; জমিদার অথচ সাহিত্যরসিক।"

আরো শুনলাম, কলকাতায় তাঁর কয়েকখানা বাড়ীও আছে। স্কুল-কলেজে লেখা পড়া বিশেষ কিছু করেন নি। কিন্তু সাহিত্যে বেশ হাত আছে।

আপন মনে বলে উঠলাম, "নিশ্চয়ই এঁর বই-টই কিছু আছে।"

মহিলাটি সহাস্যে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, প্রতি বৎসর কবিপক্ষে কবিপ্রশস্তি ছেপে বিতরণ করেন; বন্ধুবৎসল,—খরচ-পত্রও করেন প্রচুর।"

আরো শুনলাম, তাঁর প্রতিভামুগ্ধ বন্ধু মহলে তিনি 'সাহিত্যিয়াল' বলে পরিচিত, যেমন 'কবিয়াল'।

মহিলাটি বললেন, "বেশ সমঝদার, সুরসিক বলেই মনে হয়; অবশ্য বয়স একটু বেশি হয়েছে!"

এবার পঞ্চম ছবিখানা হাতে নিয়ে বললাম, "সাহিত্যিয়ালও বাতিল হলেন; এখন এঁর উপরই সব নির্ভর করছে। এইত বেশ সুপ্রতিভ মুখখানি, ধারালো নাক, বড় বড় চোখে প্রতিভার দীপ্তি, মুখে শিশু-সুলভ সহজ হাসি, আপন ভোলা মুখখানি, অগোছাল বেশ-ভূষা—অধ্যাপক-অধ্যাপক ভাব; এঁকে গুছিয়ে চালাবার জন্যে সত্যিই একজনের দরকার। ইনি কে?"

তিনি উত্তর দিলেন, "ঠিকই ধরেছেন। ইনি কলেজের অধ্যাপক।"

আমি বললাম, "দেখুন, এই পাঁচজনের মধ্যে ইনিই বেশি যোগ্য।"

তিনি বললেন, "যোগ্যতার কথা হচ্ছে না; সত্যিকারের ভালবাসা এর মধ্যে আছে কি না কিংবা হতে পারে কি না—সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য।"

আমি উত্তর দিলাম, "জ্যোতিষের দিক থেকেই আমি উত্তরে বলব, এ ছকটি যাঁর, তাঁর সপ্তমভাব বা স্বামীভাব অনুযায়ী এরকম পাত্রই বুঝায়। আর এরূপ চেহারা বা আকৃতি প্রকৃতির লোকের ভালবাসার গভীরতাও খুব বেশি হয়ে থাকে।"

মহিলাটি জিজ্ঞাসা করেন, "কি করে বুঝলেন? আমার কিন্তু মনে হয় শিল্পীর চরিত্রেই ভালবাসার গভীরতা বেশি। শিল্পীদের আমার বেশ ভালও লাগে; অবশ্য বাস্তব জীবনে ঠকবার ভয়ও আছে, তাও ভাবি।"

হেসে উত্তর দেই, "শিল্পীদের ভালবাসায় গভীরতা বেশি যেমন মদ্যপায়ীর মদের উপর ভালবাসা,—মদের বোতলের উপর নয়; মদ খাওয়া হয়ে গেলে বোতলটা ছুড়ে ফেলে দিতে পারে।"

আমার কথা শুনে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন; "তাইত, বেশ উপমাটা দিয়েছেন।"

আমি তাঁর হাসিতে যোগ দিয়ে বললাম, "সত্যি কথা; তাঁদের স্বপ্নবিলাসী মন, কখন কোন্ স্বপ্নে বিভোর হয় বলা যায় না। আর সে বিচার করেও আমাদের লাভ নেই। আমরা পাত্রীর দিক থেকেই তা বিচার করব।"

মহিলাটি বললেন, "বেশ, তাই করুন; কিন্তু আমায় সব বুঝিয়ে বলতে হবে।"

আমি বললাম, "পাত্রীর ছকটা দেখলেই মনে হয় পাত্রী ইনটেলেকচুয়েলি এঁদের কারো চাইতে খাটো নহেন, আর তাঁর বয়সও নেহাৎ কম বলে মনে হয় না; যদিও জন্মের সাল তারিখ কিছুই ছকের মধ্যে নেই।"

আমার কথায় তাঁর মুখে সংকোচের হাসি দেখা দিল। তিনি উত্তর দিলেন, "বেশ, বোঝেনই ত এ বয়সে অপরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা কত কঠিন।"

আমি বললাম, "তার জন্যই এদেশে ছোটবেলায় বিয়ে দেবার প্রথা ছিল; তাই যেন-তেন প্রকারে নূতন পরিবেশে গড়ে উঠবার বা নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার সুযোগ তারা পেত।"

মহিলাটি বললেন, "তাতে কি সবাই সুখী হ'ত? সত্যিকারের ভালবাসার স্বাদ কি তারা পেত?"

আমি উত্তর দিলাম, "ভালবাসা বুঝি না ; মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বলা চলে, উদ্ভিন্ন যৌবনে বা কৈশোরে প্রথম মিলনে একটা অদ্ভুত মন্ত্রশক্তি আছে, যাতে করে আপনা-আপনি দুজনের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন এসে যায়।"

তিনি হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবেগের সুরে বলে উঠলেন, "কি বললেন ? উদ্ভিন্ন যৌবনে প্রথম মিলনের একটা অদ্ভুত মন্ত্রশক্তি আছে।—মন্ত্রশক্তি ? মোহ না যাদুকরী শক্তি ! —হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি ! সত্যি বলেই বোধ হচ্ছে আপনার কথা ! আচ্ছা পণ্ডিত মশাই, আপনার জ্যোতিষে কি তাই বলে ? আপনি কি মনস্তাত্ত্বিক ? না সাহিত্যিক ?"

মহিলাটির জীবনতন্ত্রীর কোন গোপন তারে যেন আঘাত লেগেছে। তাঁর বিচলিত ভাব আমাকে বিস্মিত করল।

আমি উত্তর দিলাম, "না না না, আমি সাহিত্যিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক কিছুই নই। জ্যোতিষ শুধু আঙ্কিক বিদ্যা নয়, মানুষের মন নিয়েই আমাদের কারবার ; ঘেঁটে ঘেঁটে অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু জানতে পেরেছি।"

তিনি নিজেকে এবার সংযত করে উত্তর দিলেন, "সবই বুঝি, ছোট বেলায় মেয়েদের, আর শুধু মেয়েদের বলি কেন, ছেলেদেরও মিলনের পথ বেঁধে দেওয়া দরকার। উদ্ভিন্ন যৌবনের মিলনই সুন্দর ও সার্থক হতে পারে। নিছক ভালবাসার কোন মূল্যই বাস্তব জগতে নেই।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, বাস্তব জীবনটাই আমাদের দেখতে হবে। ভালবাসা একটা আকর্ষণ বৈ ত কিছুই নয়। তার বন্ধনেই

সংসার চলেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সে বন্ধন না থাকলে সংসারে শান্তি আসতে পারে না; উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভর করতে কিংবা বিশ্বাস করতে পারে না। জ্যোতিষের দিক থেকে যোটক বিচারে আমরা সেটাই দেখি।"

তিনি প্রশ্ন করেন, "একেবারে অজানা দুজনের মধ্যে এরূপ বিচারে কি মিলনের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়?"

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, "নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। বয়সের তারতম্য অবশ্য দেখতে হয়। আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে উভয়ের মৌলিক গুণাগুণ বা উপাদানের দিকে। উপাদান এক-জাতীয় হ'লে বয়সের বাধা বা সংকোচ দূর হতে পারে। অবশ্য প্রথম যৌবনে তা যত সহজে হয়, পরিপক্ক বয়সে তত সহজে হয় না। বয়স্কদের পক্ষে পরিচিতি, ভাববিনিময় ও মেলামেশার মধ্য দিয়েই সে কাজটা সহজ হতে পারে।"

তিনি বললেন, "ঠিক কথাই বলেছেন। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই পাত্রী মেলামেশা বা ভাববিনিময়ের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু সমস্যা মিটছে না।"

আমি উত্তর দিলাম, "কেন? তাহলে ত কথাই নেই; এখন আমি যা সাজেষ্ট করছি, তা পরীক্ষা করে দেখুন।"

তিনি বললেন, "সেটাই হ'ল আসল সমস্যা। এঁদের প্রত্যেকেই প্রার্থী। নানাভাবে নিজেদের আগ্রহ বা মনের ভাব এঁরা প্রকাশ করেছেন শুধু এই পঞ্চম ব্যক্তিটি ছাড়া। অথচ তাঁকেই আপনি নির্দেশ করতে চাইছেন।"

আমি বললাম, "তাঁর ভালবাসাই খাঁটি; তিনিও প্রার্থী,—

কিন্তু এঁদের মত নির্লজ্জ নন; তিনি সত্যই ভালবাসেন এই পাত্রীকে।"

"কি বললেন? তিনি সত্যিই এই পাত্রীকে ভালবাসেন?" —তাঁর কথাবার্তায় প্রবল উচ্ছ্বাস; প্রসন্নতার হাসি দেখি তাঁর মুখে।

"বড় মুখচোরা, অগোছাল লাজুক মানুষ! কি করে যে কলেজে লেকচার দিয়ে এতগুলি ছেলেকে মুগ্ধ করে তুলেন তিনি,—বুঝতেই পারি নে। কিন্তু বড় ভাল মানুষ—বড় আপন-ভোলা ভাব! চাইতে এসেও চাইতে পারে না!"—আবেগের স্বরে মহিলা যেন ভেঙ্গে পড়লেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—উদ্ভিন্ন যৌবনের দেখা,—প্রথম সাক্ষাৎ; অথচ বড় নীরব! সত্যিই কি তিনি আমায় ভালবাসেন? সত্যিই কি তিনি আমাকে চান?"

বিস্ময়বিমূঢ় আমি! মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনাকে? তাহলে আপনারই ছক এটা?"

ছবিগুলি সযত্নে গুটিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগে পুরতে পুরতে তিনি বললেন, "সত্যিই আপনি আমার বড় উপকার করলেন। আমারই ছক এটা।"

পুনর্ভূ

অধ্যাপক কাঞ্জিলালের কথাই বারবার মনে পড়ছে।

এইমাত্র ভদ্রলোক চলে গেলেন। হাসি আর চেপে রাখতে পারি না। এতক্ষণ দম বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছিল। হঠাৎ হিঃ হিঃ করে সশব্দে হেসে উঠলাম। আমার মেজো মেয়ে রেবা পাশের ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল; আমার হাসির কলরবে আকৃষ্ট হয়ে এ ঘরে উঁকি মারলে। অন্য কাউকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "একি বাবা! একা একা এমন করে হাসছো যে? কি হয়েছে?"

"নারে না, তোদের সবিতাকাকাই হাসিয়ে দিয়ে গেল।"

"কেন, তিনি আবার কি করলেন?"

আসল ব্যাপারটা মেয়েকে বলতে পারি নে। তাই ঘটনাটা চাপা দিতে গিয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, "ওই পুনর্ভূ,—না, না, তেমন কিছুই নয়, ওটা জ্যোতিষের একটা কথা কিনা।"

মেয়ে হয়ত কিছুই বুঝতে পারলে না। সে বললে, "আজ যে সবিতাকাকা চা না খেয়েই চলে গেলেন?"

আমার ছেলেমেয়েদের সকলেই অধ্যাপক সবিতা কাঞ্জিলালকে ভালভাবেই জানে; তিনি এলে কমপক্ষে দু-তিন ঘণ্টা গল্পগুজব করে সময় কাটান ও দু'তিনবার চায়ের ফরমাস করেন; আজ তার ব্যতিক্রম হয়েছে। কয়েক বছর আগেকার দু'দণ্ডের পরিচয়, এখন বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে।

বিজ্ঞানী মানুষ কাঞ্জিলাল এই অবিজ্ঞানী জ্যোতিষীর দপ্তরে প্রায়ই হাজিরা দিয়ে থাকেন, নিতান্ত বন্ধুত্বের খাতিরেই। তাঁর মতে অবৈজ্ঞানিক এই জ্যোতিষী কুসংস্কার ইণ্ডিয়ার সর্বনাশ করেছে; ইহা মানুষকে অদৃষ্টবাদী ও অকর্মণ্য করে তুলে।

সবিতা কাঞ্জিলাল লম্বা-চওড়া চেহারার স্বাস্থ্যবান পুরুষ; ধীর স্থির প্রকৃতির সাদাসিদে লোক হলেও তাঁর মধ্যে তেজস্বিতার অভাব নেই। নিজের মতকে আঁকড়ে ধরে থাকাই তাঁর স্বভাব। প্রত্যক্ষ সত্য ভিন্ন তিনি কিছুই বিশ্বাস করেন না। ভয়ানক জেদী; মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই যেন তাঁর জন্ম হয়েছে।

বিদেশে পড়তে যাবার সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন; কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সেই দাণ্ডি-অভিযানের দিনে স্বেচ্ছায় ষ্টেটস্কলার-শিপটাও ছেড়ে দিয়েছিলেন তরুণ কৃতী ছাত্র সবিতা কাঞ্জিলাল। একেই বলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা!

জেলে যাওয়া কিংবা হৈ-হল্লা করে কোন আন্দোলন করাও তিনি পছন্দ করেন না। তিনি নীরব কর্মী। তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃত্তিশিক্ষায়ই দেশকে গড়ে তুলতে হবে। সেই কাজেই তিনি জীবনপণ করেছেন। নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয় বলে তিনি দু'-একবার বড় চাকুরীও ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি নিজেই গড়ে তুলেছেন বৃত্তিশিক্ষামূলক এক শিক্ষায়তন। কিন্তু সে কি কৃচ্ছ্র সাধনা। না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

অধ্যাপক-গৃহিণী সুচিত্রা দেবীর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। পাড়াগাঁয়ের এক দরিদ্র শিক্ষকের কন্যা তিনি। মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই তিনি অবশ্য সন্তুষ্ট; কিন্তু যুগধর্মের পরিবেশ

মাঝে মাঝে তাঁকেও বিচলিত করে তুলে। বে-হিসাবী অধ্যাপকের এই স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্রতা সুচিত্রা দেবী বরণ করে নিলেও এখন পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাঁর আক্ষেপ মাঝে মাঝে আক্রোশে রূপান্তরিত হয়। সে সময় সবিতা কাঞ্জিলাল জ্যোতিষীর আড্ডায় কিংবা তাঁর শিক্ষায়তনের কারখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন ; ইদানীং এই ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটছে।

কুঙ্কুম আর করবী কাঞ্জিলাল-দম্পতির ছেলে আর মেয়ে। করবী এখন কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। কাঞ্জিলালের ইচ্ছা যে, করবীর মাধ্যমে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করবেন তিনি। আর ফুটফুটে নয়-দশ বছরের ছেলে কুঙ্কুম। তার মুখে হাসি লেগেই আছে। কুঙ্কুমের সম্বন্ধে তিনি অনেক আশাই পোষণ করেন।

জ্যোতিষে বিশ্বাস না থাকলেও বর্তমানে ছেলেমেয়েদের জন্য একটা মানসিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে অধ্যাপক কাঞ্জিলালের। নিজের জন্ম-সময় সঠিক জানা না থাকায় বড় সমস্যায় তিনি পড়েছেন ; তাঁর সন্তানভাগ্য তিনি যাচাই করে দেখতে চান। সেকালের কেউ আর বেঁচে নেই—তাঁর জন্মকালের সাক্ষ্য দিতে। তারিখটা বাবার একটা খাতায় লেখা ছিল। মকর কিংবা কর্কট কোন লগ্নে জন্ম, কোন জ্যোতিষীই তার সঠিক মীমাংসা করতে পারেন নি। বিজ্ঞানী অধ্যাপককে ভাঁওতা দিয়ে বোঝান বড় কঠিন কাজ।

কুঙ্কুম আর করবীর রাশিচক্র ঘাঁটাঘাটি করতে করতে তিনি জ্যোতিষের প্রায় সকল বই-ই পড়ে ফেলেছেন। আমার সঙ্গে

এই সূত্রেই তাঁর পরিচয়। তিনি জ্যোতিষের যাথার্থ্য পরীক্ষা করে দেখতে চান।

এই সদানন্দ আপনভোলা মানুষটিকে আমার ভালই লাগে। তিনি প্রায়ই আসেন এবং আমার জ্যোতিষের বইপত্র নাড়াচাড়া করেন। পাড়াগাঁয়ের শিক্ষক-কন্যা মাঝে মাঝে এই আপন-ভোলা মানুষটিকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করে তুলেন। করবী এই ত আঠারোয় পড়ল; তাঁর বিয়ের কোন চেষ্টাচরিত্র ভদ্রলোকের নাই। অধ্যাপক কাঞ্জিলালের এত লেখা কাগজে বের হয়; তাঁর এত সুনাম! কিন্তু নামে কি হবে? কি করে যে সংসার চলে, তা কেউ বুঝে না। আর কাঞ্জিলালের ইনষ্টিটিউশন?—পুরোনো ভাঙা বাড়ীতে একটা ভাঙা যন্ত্রপাতি আর লোহালক্কড়ের গুদোম বললেই চলে।

কয়েকদিন ধরেই অধ্যাপক কাঞ্জিলালের একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করছি; তাঁকে বিশেষ চিন্তাকুল বলেই মনে হল। বেশী কথাবার্তা বলেন না; ভাবলাম, সংসারের চাপ একটু ভাবনায়ই ফেলেছে। আমি নীরবই রইলাম।

আজ হঠাৎ কাঞ্জিলাল আমাকে প্রশ্ন করলেন, "দেখুন পণ্ডিতমশাই, জ্যোতিষে 'পুনর্ভূ' বলে একটা যোগ আছে না?"

আমি বললাম "হ্যাঁ আছে, কি হয়েছে তাতে? পুনর্ভূ মানে আবার বিবাহ; অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহের যোগ।"

অধ্যাপক বললেন, "আচ্ছা এরকম কোন মেয়ের কোষ্ঠী আপনি দেখেছেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "মাত্র একটি দেখেছি। ষোল বছরের একটি মেয়ে বিধবা হলে তার বাবা আবার মেয়েটির বিবাহ দেন; তার আগে আর কোন অমঙ্গল হতে পারে কিনা জানার জন্য আমাকে মেয়েটির কোষ্ঠী দেখিয়েছিলেন।"

অধ্যাপক বললেন, "সত্যি তাতে এরূপ কোন যোগ ছিল কি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ ছিল।"

এবার অধ্যাপক কাঞ্জিলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তা হলে কথাটা ঠিকই বলেছে, ক্রূরেহস্তে বিধবা ভবতি পুনর্ভূশ্চ শুভাশুভৈঃ।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, ঠিক বৈ কি? সপ্তমে পাপগ্রহ থাকলে বিধবা হয়, আর শুভাশুভ গ্রহ থাকলে আবার বিবাহ হয়।"

কাঞ্জিলাল বললেন, "সেই মেয়েটার কি ছিল?"

আমি বললাম, "মঙ্গল আর শুক্র ছিল; মঙ্গল পাপগ্রহ আর শুক্র শুভগ্রহ।"

অধ্যাপক বলে উঠলেন, "সব ক্ষেত্রেই যে তা ঠিক মিলে যাবে, তাকি জোর করে বলা চলে?"

আমি উত্তরে বলি, "যে সব বিধবার আবার বিবাহ হয়েছে, তাদের কোষ্ঠী দেখলেই তা বুঝা যাবে।"

অধ্যাপক বললেন, "সে ত সম্ভব হতে পারে না। আর একটি মাত্র বিধবার কোষ্ঠী ত তা প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।"

আমি বললাম, "আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি; কিন্তু

আমার মনে হয়, বহু অভিজ্ঞতার ফলেই এরূপ বচনের সৃষ্টি হয়েছে।"

তিনি বললেন, "বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র—তিনটি মাত্র শুভগ্রহ।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তবে ক্ষীণ না হলে চন্দ্রকেও শুভগ্রহ ধরা হয়।"

অধ্যাপক এবার জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, "আচ্ছা, পুনর্ভূ মানে ত আবার বিবাহ; তাহলে ডাইভোর্সের পর আবার যাদের বিবাহ হয়, তাদের বেলায় ত একথা খাটে।"

এরূপ একটি প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছিল; তাঁর কথায় সায় দিয়া বললাম, "হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।"

তিনি বললেন, "এরূপ কোন মেয়ের কোষ্ঠী আপনি দেখেছেন কি?"

আমি হেসে বললাম, "এরূপ বিয়েতে জ্যোতিষের ধার ধারে না। প্রেম করেই যারা বিয়ের ফাঁস পরতে এগিয়ে চলেছে, তারা জ্যোতিষীর কাছে এসে সে-প্রেমের কি যাচাই করে নেবার অবকাশ পায়?"

অধ্যাপক কাঞ্জিলাল আমার কথা শুনে নিজেও হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, "আচ্ছা, এখন থেকে এরূপ মেয়েদের কোষ্ঠী যোগাড় করে দেখবেন ত?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু যে সব মহলে ডাইভোর্সের কারবার, সে সব মহলের কেউ এদিকে বড় আসে না।"

তিনি বললেন, "এখন আকছারই এরূপ ঘটবে ; জানেন ত, আইন পাশ হয়ে গেছে।"

নূতন করে বিবাহ-বিধি রচিত হয়েছে, তা জানতাম ; বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের কথাও শুনেছি, কিন্তু এ বয়সে সে-সব বিধির বিষয়ে মাথা ঘামাবার মত অবকাশ ছিল না। অধ্যাপক কান্তিলালকে বললাম, "হ্যাঁ, কতই দেখব ? আমাদের তাতে চিন্তার কোন কারণও নেই। আমার কিংবা আপনার ফাঁস আমরণই থাকবে ; তার জন্য ভাবনা কেন ?"

অধ্যাপকের মুখে হাসি দেখা দিল, তিনি বললেন, "জ্যোতিষ যদি সত্য হয়, তাহলে চিন্তার কারণ আছে বৈ কি ?"

সহাস্যে বললাম, "আমি ত দুশ্চিন্তার কোন কারণ দেখি নে। আপনার কিংবা আমার গিন্নী নিশ্চয়ই এই পঞ্চাশ বছর বয়সে আমাদের ডাইভোর্স করে বসবেন না। আমাদের উপর না হোক, ছেলেমেয়েদের উপর ত একটা টান আছে।"

তিনি বললেন, "আপনার দুশ্চিন্তার কারণ না থাকতে পারে ; কিন্তু সত্যি যদি কারো কোষ্ঠীতে পুনর্ভূ যোগ থাকে, তাহলে কি হবে ?"

আমি বললাম, "যার আছে, তার আছে ; এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ?"

এইবার বন্ধুবর কান্তিলাল গম্ভীর হয়ে বললেন, "দেখুন পণ্ডিতমশাই, আপনাদের এই জ্যোতিষের উপর আমার মোটেই কোন আস্থা ছিল না ; কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখছি, মানুষের

যোগ্যতা আর প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্যোতিষ অনেকখানি বলতে পারে। এটা লজিকের মত একটা শাস্ত্র।"

আমি বললাম, "তা সত্যি, এবিষয়ে গবেষণা করবার অনেক কিছু এখনও বাকি রয়েছে। এই যেমন, পুনর্ভূ যোগ।

কথাটা যেন তাঁকে অধীর করে তুলল। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে হয়, দশটা-পাঁচটা দেখে লজিকের মতই এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে আপনাদের জ্যোতিষ।"

আমি উত্তর দিলাম, "ঠিক কথা। আরো দশটা-পাঁচটা দেখলে আমরাও জোর করে কিছু বলতে পারব।"

তিনি বললেন, "ওই পুনর্ভূ যোগটা যে আমায় বড় দুশ্চিন্তায় ফেলেছে পণ্ডিতমশাই।"

আমি বললাম, "কেন? কি হয়েছে? আপনার নিকট আত্মীয়া কারো কোষ্ঠীতে এরূপ যোগ আছে না কি?"

একটু ইতস্তত করে অধ্যাপক বন্ধু বললেন, "না, না, আমার আবার নিকট-আত্মীয়া কে আছে? আমি কুঙ্কুম আর করবীর ভবিষ্যৎ ভেবেই দুশ্চিন্তায় পড়েছি।"

তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হলাম। কুঙ্কুম ব্যাটা ছেলে। তার বিপত্নীক যোগ থাকলেও ভাবনার তেমন কিছু নেই, তবে কি করবীর কোষ্ঠীতে এরূপ কোন যোগ আছে! অধ্যাপক বন্ধুকে বললাম, "কৈ, করবীর কোষ্ঠী ত আমি দেখেছি; এরকম কোন যোগ ত আমার চোখে পড়ে নি।"

আক্ষেপের সুরে তিনি বলে উঠলেন, "আরে ছিঃ! করবীর



কোষ্ঠীতে নয়; করবীর মায়ের কোষ্ঠীই আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছে।"

প্রৌঢ় অধ্যাপকের এরূপ দুর্বলতায় আমার হাসি পেয়ে গেল। রসিকতা করে বললাম, "সুচিত্রা দেবীর কোষ্ঠীতে এরূপ যোগ রয়েছে নাকি? বেশ, বেশ, তিনি না হয় পুনর্ভূ হবেন, কিন্তু আপনি বেঁচে থাকতে ত নয়।"

অধ্যাপক মহাশয় এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আপনি রসিকতা করছেন পণ্ডিতমশাই। আমার কিন্তু পাগল হবার যোগাড় হয়েছে। তিনদিন ধরে ঘুম নেই, কাজকর্ম সব চুলোয় গেছে।"

বুঝলাম জ্যোতিষের প্রবচন বিজ্ঞানী অধ্যাপকের মনে ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। এই ধাঁধার সমাধান না হলে সরল-বিশ্বাসী মানুষটি কিছুতেই শান্তি পাবেন না।

তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্য বললাম, "দেখুন সবিতাবাবু, সুচিত্রা দেবীর কোষ্ঠীও আমি দেখেছি, এরকম কিছু তাতে আছে বলে আমার মনে হয় না।"

তিনি বললেন, "কেন, তাঁর সপ্তমে মঙ্গল আর বৃহস্পতি রয়েছে যে!—একটা শুভ আর একটা অশুভ?"

জ্যোতিষের একখানি বই তাঁর সামনে খুলে ধরে বললাম, "এটা কি জানেন না, বৃহস্পতি এরূপ জায়গায় থাকলে বৈধব্য খণ্ডন হয়; এমন কি 'পুনর্ভূ' হবারও ভয় থাকে না। এই দেখুন—।"

অধ্যাপকের অধীরতা অনেকটা শান্ত হ'ল তিনি বললেন,

"তাইত, এ-কথাটা ভাবি নি। যাই বলুন মশাই, আপনাদের জ্যোতিষে অনেক ফাঁকফুঁক রয়েছে। দেখা যাক কি হয়।"

আমি সহাস্যে বললাম, "হবে আর কি? হলেও আপনি দেখতে পাবেন না।"

অধ্যাপক কাঞ্জিলাল আমার কথায় সন্তুষ্ট হলেন না; তাঁর মনে যে গভীর সংশয় জেগেছে। শাস্ত্রের বচনে বিজ্ঞানীকে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ সাংসারিক অনটনে অধ্যাপক-গৃহিণীর বর্তমান আচরণ অধ্যাপকের মনে আরো সংশয় জাগিয়েছে।

আমার কথায় আবার যেন তাঁর মুখের উপর কালোছায়া নামলো; তিনি অধীর হয়ে বললেন, "জানিনে আমার কুঙ্কুম আর করবীর অদৃষ্টে কি আছে? এদেশে এসব পোষায় না মশাই। মায়ের কেলেঙ্কারি কোন্ ছেলেমেয়ে সহ্য করতে পারে?"

আমি বললাম, "কালে কালে সবই সইবে মশাই; কিন্তু আপনার ছেলেমেয়েদের তা কখনও সইতে হবে না,—এ আমি জোর করে বলতে পারি।"

"তাই হোক,—আপনার উপর আমার বিশ্বাস আছে পণ্ডিতমশাই; আপনার কথা সত্যি হোক্। কিন্তু একটা অনুরোধ বাড়ীতে এ কথাটা ফাঁস করে দেবেন না; তাহলে সর্বনাশ হবে। আজ উঠি, অনেক কাজ পড়ে আছে।"—মাথা চুলকাতে চুলকাতে কথাগুলি বলে অধ্যাপক সবিতা কাঞ্জিলাল উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর মুখের কালোছায়া দূর হ'লেও মনের সংশয় দূর হয়েছে বলে মনে হ'ল না।

ধাক্কার চোটে উদ্‌ভ্রান্ত যুবকটির সকল কথা শুনে এমন হাসি পেয়েছিল যে সে হাসির ধাক্কা আমাকে অতি কষ্টে সামলাতে হয়েছিল।

হ্যাঁ, সংসারের নানাক্ষেত্রে ধাক্কা-বিড়ম্বিতেরাই জ্যোতিষীর দরবারে হাজির হয়ে থাকেন, ইহা সত্য। কিন্তু এ ধাক্কা সেরকমের কিছুই নহে; সে আচমকা একজনের উপর পড়ে গিয়েছিল।

এরকম ধাক্কাত নাগরিক জীবনের প্রায় নিত্যকার ঘটনা। রাস্তায়-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, হাটে-বাজারে কিংবা পথ চলতে আচমকা ধাক্কা যে কেউ কোন দিন না খেয়েছেন, তা হলফ করে বলতে পারেন কি ?

মাঠে-ময়দানে খেলার মাঠে ত ধাক্কাধাক্কি অনবরত লেগেই আছে। তারপর মনুমেণ্টের তলায় কিংবা কোন পার্কে নরম-গরম বক্তৃতা শুনবার আগ্রহে ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি ত হামেশাই হয়ে থাকে। ঘটনাচক্রে সেই জনতা বা বক্তৃতা যদি বে-আইনী বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সময় সময় লাঠি আর কাঁদুনে গ্যাসের ঠেলায় ধাক্কাধাক্কি আবার প্রাণান্তকর হয়ে উঠে।

ট্রামে-বাসে ঠেলাঠেলি ও ঠাসাঠাসির মধ্যেও যখন লেডীর (ট্রাম-বাসের ভাষায়) আবির্ভাব ঘটে, তখন পাছে তাঁর গায়ে ধাক্কা লাগে, এই ভয়ে আমাদের বিপুলদার মত ভদ্র ব্যক্তিকেও

তাঁর আড়াইমণি বিরাট বপুটাকে শ্বাস টেনে অন্ততঃ আড়াই ইঞ্চি সংকুচিত করতে হয়।

যুবকটির কথাই বলি। স্বাস্থ্যবান সুন্দর গঠন; মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা; চোখ দুটি টানা টানা হলেও বেশ বড় বড়। মুখখানাতে কমনীয়তা ও প্রতিভার দীপ্তি রয়েছে; কিন্তু তার মধ্যেও উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের একটা অশান্তভাব দেখা দিয়েছে।

আমার জ্যোতিষী জীবনে এমনি কতজন আসে যায়; চোখের সামনে তাদের ছায়ামূর্ত্তি ঘুরে বেড়ায়। তারা জানতে চায়,—দৈব কি বলে? এক এক সময় হাসি পায়, দুঃখও হয়। অতি সাধারণ ব্যাপারকেও তারা জটিল করে তুলে; তিলকে তাল করে, তুচ্ছ ঘটনার মনগড়া মানে ক'রে মানুষ অনেক সময় নিজের জীবনকে বিড়ম্বিত করে তুলে; লোকের চোখে বাতিকগ্রস্ত উন্মাদও হয়ে উঠতে পারে সে।

এমনি একটা তুচ্ছ ঘটনা যুবকটিকে বিভ্রান্ত করেছিল। কিন্তু তার পরিণতি যে তাঁর অনুকূল হবে, তা আমিও ভাবতে পারি নি। চব্বিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, বেশভূষায় একটা অগোছাল ভাব, তবুও তাতে তাঁকে সুন্দর লাগে।

যেন কোন গোপন কথা! ফিস ফিস করে সে বলে, "একটু নিরিবিলিতে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"বলুন না, এখানে ত এখন কেউ নেই।"

"না, না, কেউ এসে পড়তে পারে।"—চাঞ্চল্য ও সংকোচ-

ভরা তাঁর কণ্ঠস্বর। প্রায় আমার মুখের কাছে সে এগিয়ে এসে বললে, "খুব গোপন কথা কি না ?"

আমি সাহস দিয়ে বললাম, "বলুন, কেউ এখন আসবে না ; যদিবা আসে তখন দেখা যাবে।"

যুবকটি এবার বললে, "দেখুন আমি বড় সমস্যায় পড়েছি। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ আপনার কথার উপর নির্ভর করছে।"

"দেখি, আপনার কোষ্ঠী আছে ?"

"আছে, কিন্তু আমি শুধু ছকটা নিয়ে এসেছি।"

"বেশ তাতেই কাজ চলবে।"

তাঁর হাত থেকে ছকের কাগজখানা নিলাম। কিছুক্ষণ ছকটা দেখে বললাম, "কেন, কি, হয়েছে ? আমি ত এমন কোন বিপদ্-আপদের আভাস পাচ্ছি নে।"

যুবকটি ব্যস্তভাবে বললে "না, না, বিপদ্-আপদ্ হতে যাবে কেন ? বলেছি ত আমি এক জটিল সমস্যায় পড়েছি, তাতে আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।"

আমি আবার ছকখানি ভাল করে পরীক্ষা করলাম, "কই, আমি বরং এখন ভালই দেখছি ; ছকটা দেখলেই মনে হয়, আপনার জীবনে ঝামেলা বিশেষ কিছু নেই। বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিবে আপনার জীবন। লেখাপড়া-কাজকর্ম সব দিক্ থেকেই ভাল বলা চলে। তবে শনির একটা প্রভাব রয়েছে মনের উপর ; তাতে অযথা চিন্তা মাঝে মাঝে বিব্রত করে তুলতে পারে।"

যুবকটি বললে, "ঠিক কথাই বলেছেন ; পরীক্ষায় বেশ

ভালই করেছি ; এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের পরীক্ষায় সিলেক্‌টেডও হয়েছি ; কিন্তু এ সব চাকুরী আমার ভাল লাগে না। মনে করছি, এম. এ-টা দিয়ে কোন কলেজে ঢুকে পড়বো।"

আমি বললাম, "তা বেশ, বৃহস্পতি আর শুক্রের প্রভাবে এ সুযোগ আপনি শীগ্‌গিরই পাবেন। পারিবারিক জীবনেও সুখী হবার কথা। বিয়ে নিশ্চয়ই করেন নি ; কিন্তু এখনই তা হয়ে যেতে পারে।"

এবার আমার কথায় সে অধীর হয়ে উঠল ; "কি বললেন, এক্ষুণি হতে পারে? কিন্তু—কিন্তু—এই বিয়ের ব্যাপারেই সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

আমি উত্তর দিলাম, "কোন সমস্যা দেখা দেওয়ার কথা ত নয়, ভাল পাত্রীই বুঝায়। তা হলে কি বাপমায়ের সঙ্গে এ নিয়ে কোন মতবিরোধ ঘটেছে?"

যুবক বললে, "না, না, মতবিরোধ বলা চলে না। বিয়ের ব্যাপারে আমার নিজের কোন মতামতই ছিল না ; বিয়ে আমি করব না বলেই ঠিক করেছিলাম।"

আমি বললাম, "ও বুঝেছি, নিশ্চয়ই আপনার মনোমত জায়গায় আপনি বিয়ে করতে চান ; কিন্তু অভিভাবকদের দিক্‌ থেকে বাধা আসতে পারে, এই ভেবে এখন বিয়েটাই এড়িয়ে যেতে চান।"

সে বললে, "না ঠিক তাও নয় ; পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি ; মেয়েদের সম্বন্ধে কোন দিন চিন্তাও করি নি। সবাই জানে, মেয়েদের আমি ঘৃণা করি ; কিন্তু সেটাও ঠিক নয়, আমার

আদর্শ অন্য ধরনের। "স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের উপর ছোটবেলা থেকেই আমার ঝোঁক।"

সহাস্যে বললাম, "ঠিক কথা, আপনার আদর্শ মহানই হবে। কিন্তু সন্ন্যাসের আদর্শ মহান্ হলেও প্রত্যেক বাপ্‌মা-ই ছেলেদের বিয়ে দিয়ে সংসারী করতে চান।"

সে বললে, "এদিক থেকে আমার মায়ের একটা ভয়ও আছে; আমি তাঁদের একমাত্র ছেলে কি না? তাই তাঁরা নিজেদের পছন্দমত এক জায়গায় বিয়ে ঠিক করেছেন।"

আমি বললাম, "বুঝেছি, আপনি সেখানে বিয়ে করতে রাজি নন।"

যুবকটি বললে, "রাজি-অরাজির কথা ওঠেই নি। আমাকে পছন্দ করে নিতে তাঁরা বলেছেন; কিন্তু আমার এক কথা, আমি বিয়েই করব না; তখন দেখাদেখি কিংবা পছন্দ-অপছন্দর কি আছে? ঐ সম্বন্ধে আমি কোন দিন কিছু জানতেও চাই নি বা জানার আগ্রহও দেখাই নি।"

"তারপর কি হয়েছে?"

"তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছে। শুনেছি, সেও নাকি কলেজে পড়ে, দেখতেও মন্দ নয়। আর কিছুই আমি জানি নে।"

এবার তাঁকে বললাম, "এ মেয়ে এসে যে আপনাকে সুখী করতে পারবে না, তা কি করে ধরে নিচ্ছেন? আর নিজের কোনরূপ গোপন ইচ্ছা থাকলে মায়ের কাছে তা প্রকাশ করে পারেন।"

যুবক উদ্বেলিত হয়ে বললে, "আমি ত আগেই বলেছি, গোপন ইচ্ছা বা প্রেমপ্রীতির ব্যাপারের ধার দিয়েও আমি যাই নি। আমার মনে হয়, মেয়েরা রীতিমত আমাকে ভয় না করলেও নিশ্চয়ই অবজ্ঞা করে।"

যুবকের কথায় হাসি পায়। তাঁকে বললাম, "কি করে তা বুঝলেন ? তাদের সঙ্গে মেলামেশা যখন আপনি করেন নি ?"

যুবক বললে, "করিনি বটে ; কিন্তু আমার চালচলন ও কথাবার্তায় নাকি তা ফুটে ওঠে ; আমার ছোট বোন নীলি ত তাই বলে।"

আমি বললাম, "সমস্যা বটে, আপনি বিয়ে করতে চান না অথচ এখনই আপনাকে বিয়ে করতে হবে।"

সে বললে, "হ্যাঁ, আমার মা এত অসুস্থ যে, এখন নাও বলতে পারি নে ; তাঁর হার্টের গোলমাল কি না ; ফার্ষ্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে।"

আমি উত্তর দিলাম, "দেখুন, আপনার ছক দেখে মনে হচ্ছে ভয় পাবার মত কিছুই নেই ; আপনি সুখীই হবেন।"

সে চঞ্চল হয়ে উত্তর দিলে, "এখানেই আমার খটকা লেগেছে। যদিও বরাবরই বিয়ের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ ছিল না ; বরং এটা একটা অসহ্য ব্যাপার বলেই ধারণা করেছি ; কিন্তু ইদানীং একটা ঘটনায় আমার সব গুলিয়ে গেছে।"

যুবকের কথায় হাসি পায় এবং কৌতূহল বাড়ে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে ইদানীং কারো প্রভাব বা সাহচর্য নিশ্চয়ই আপনার মতটা বদলে দিয়েছে।"

যুবকটি এবার যেন ঢোক গিলে উত্তর দিলে, "প্রভাব-টভাব তেমন কিছু বলতে পারি নে ; তবে একটা ঘটনা আমার সব সংকল্প চুরমার করে দিয়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে ?"

সে উত্তর দিল, "হঠাৎ একজন আমার জীবনে তোলপাড় ঘটিয়ে দিলে।"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই সে কোন তরুণী ; এবং তা হলে বলুন তারই সঙ্গে—"

সে আমার কথায় বাধা দিয়ে বললে, "না, না, আপনি যা ভেবেছেন, তা নয়। কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় কিংবা প্রেমটেম ওসব কিচ্ছুই হয় নি। তবুও মনে হচ্ছে, সে-ই দূরে থেকে আমার জীবনটা ব্যর্থ করে দেবে; আবার নতুন করে আর একজনের জীবনও মিছামিছি ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

অতি কষ্টে হাসি চেপে বললাম, "আলাপ-পরিচয় নেই। তাহলে দূর থেকে দেখে ভাল লেগেছে বলুন, অথবা তার প্রতি সহানুভূতির কোন কারণ ঘটেছে।"

যুবকটি বললে, "সেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে ; কোন পরিচয় নেই, শুধু আচমকা একটা ধাক্কা ! কলেজ ইউনিয়নের ডিবেটিং ক্লাবে নারী-প্রগতির সম্বন্ধে লেকচার দিয়েছি সেদিন, বেহায়াপনা সম্পর্কে বেশ কড়া কড়া কথা বলেছি ? তারপর হল থেকে বের হয়ে আনমনা নেমে যাচ্ছি, কোন দিকে লক্ষ্য নেই। হঠাৎ আচমকা একটা ধাক্কা। লজ্জায় মাথা কাটা যায় ; সামনে

তাকিয়ে দেখি, একটি মেয়ে; মুখে-চোখে তার আঘাত লেগেছে। তবুও তার মুখে হাসি।"

সহানুভূতির সুরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারও নিশ্চয়ই লেগেছিল।"

যুবক বললে, "হ্যাঁ লেগেছিল বৈ কি! কিন্তু তাঁর ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছিল। কি করব ভেবেই পাই নি। তাকে ধরে তুলতে যাবার আগেই সে নিজে উঠে দাঁড়াল। আমি বললেম, 'সরি! আমায় মাপ করবেন'।"

"তারপর কি হল?"—আমার প্রশ্ন।

যুবক বললে, "কিন্তু কি আশ্চর্য! মেয়েটি রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হেসে বললে, সাবধান হয়ে চলবেন; রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া কত কি আছে। তারপর হন্‌হন্ করে ছুটে পালাল। কি আশ্চর্য তার সহ্য করবার শক্তি!"

আমি বললেম, "হ্যাঁ, মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি আশ্চর্যই বটে। আচ্ছা, তার সঙ্গে আর আপনার দেখাসাক্ষাৎ হয় কি?"

সে উত্তর দিল, "মাসখানেক আগে এটা ঘটেছে। বিশেষ কোন খোঁজ-খবর নেওয়া সম্ভবও নয়। কলেজে দস্তুরমত আমার একটা মর্যাদা বা পজিশন আছে। কখন-সখন তাকে হঠাৎ দেখতে পাই বটে, কিন্তু মুখোমুখি হলেই মুচকি হেসে ছুটে পালায়। কিছুই বুঝতে পারি নে। সে আমার মনোজগতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।"

আমি বললাম, "তাহলে এখন তাকেই আপনি বিয়ে করতে চান, বলুন। তা কি সম্ভব?"

সে বললে, "সম্ভব কিনা জানি নে। কিন্তু তার দিকেই আমার মন ছুটে চলেছে। এতদিনের দৃঢ়তা কোথায় উধাও হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, সে আমায় সত্যই ভালবাসে।"

আমি বললাম, "আমারও তাই মনে হয় ; মাকে তার কথা জানিয়ে দিন।'

সে উতলা হয়ে বলে উঠল, সে হয় না পণ্ডিতমশাই। কি বলতে যাব আমি ? কোন পরিচয় জানি নে ;—কলেজে পড়ে। কি নাম, কোথাকার কার মেয়ে ! সে খবরই বা তাঁরা কি করে পাবেন ? তাহলে আমাকে যে অনেকখানি নেমে আসতে হয়। আমার কোষ্ঠীতে এরূপ কোন কিছু দেখতে পান কি ?

মনোযোগের সঙ্গে কিছুক্ষণ ছকটি দেখে বললাম, "দেখুন, পরিচিতের মধ্যেই আপনার বিয়ে বুঝায়। বাপ-মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে বিরোধও বুঝায় না। আপনি চেষ্টা করে দেখুন।"

যুবকটি হতাশভাবে বললে, "আপনার জ্যোতিষ যদি ঠিক হয়, তাহলে যে আমাকে অনেকখানি নীচে নেমে আসতে হয়, সে আমি পারব না। বাপ-মায়ের দেওয়া ফাঁসই আমায় গলায় পরতে হবে। আচ্ছা এর কি কোন প্রতীকার নেই ? জ্যোতিষের দিক থেকে তা ঘটিয়ে দেবার কি কিছু নেই ?"

আমি হেসে বললাম, "আজ তাহলে আমাকেই ঘটকালি করতে হয়। চলুন, মেয়েটিকে আমায় দেখিয়ে দিন"।

সেও আমার কথায় হেসে উঠল ; তারপর বললে, না, না, বুঝেছি, তা হবার নয়। আচ্ছা, আসি নমস্কার।

আমি তাকে উৎসাহিত করে বললাম, "ভয় নেই ; আপনি সুখীই হবেন।"

সে চলে গেল ; ধাক্কার কাহিনী ভেবে আপন মনে হাসতে লাগলাম।

দিন পনরো পর একদিন বিয়ের একখানি নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। পত্রদাতা কিংবা পাত্রপাত্রী কাউকে চিনি বলে মনে হ'ল না। কিন্তু এ কি ? দু'দিন আগে যে বিয়ে হয়ে গেছে ! চিঠির উল্টো পিঠে হাতের লেখা কয়েক লাইন আমাকে বিস্মিত করল। বুঝলাম, ধাক্কা সার্থক হয়েছে,—"পণ্ডিতমশাই, শুভদৃষ্টির সময়ই বুঝতে পারলুম আপনার কথাই ঠিক হয়েছে ; পরিচিতি সার্থক হয়েছে ; এ-ই সেই। রবিবার বৌভাতের দিন আপনার আশীর্বাদ চাই-ই।"

আরো একবার হাসির চোট সামলাতে হ'ল।

রাজযোটক

বড় সমস্যায়ই পড়েছিলাম।

পাশাপাশি দু'খানি কোষ্ঠীর ছক আমার সামনে; কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম "হ্যাঁ, রাজযোটকই বটে।"

উত্তেজিত হয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "আমার মাথা আর তার মুণ্ডু! রাজযোটক না ছাই।"

ভদ্রলোকের কথায় হাসি পায়। দাম্পত্য বিভ্রাটে কি আর মাথা ঠিক থাকে? বয়স তাঁর ত্রিশ-বত্রিশ হবে। ময়লা মোটাসোটা চেহারা, তার উপর উপরের পাটির দাঁত অস্বাভাবিক রকমের উঁচু, উত্তেজনায় চোখ দুটি যেন ঘুবঘুর করে বেরিয়ে আসতে চায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে একথা-সেকথার পর আসল কথাটা পেড়েছেন।

"বড় সমস্যায় পড়েছি পণ্ডিতমশাই, কি হবে বলুন ত?"

"কি আর হবে? এরকম হয়েই থাকে।"

তিনি বললেন, "বড় ভাল মেয়ে ছিল মশাই, তেরো চৌদ্দ তখন তার বয়েস; গাঁয়ের স্কুলে ফোর্থ ক্লাশে পড়ত। চোখে লাগার মত চেহারা; কিন্তু একটু ডানপিটে আর বদরাগী ছিল। তাতে আর কি হবে; অতশত ভাবি নি; চোখে লেগেছিল বলেই আজ এ বিপদ।"

আমি বললাম, "স্বামী-স্ত্রীতে এরকম ঝগড়াঝাটি একটু-আধটু হয়েই থাকে; তার জন্যে মন খারাপ করে লাভ কি? দশ বছর যখন কাটিয়েছেন।"

তাঁর চোখ দুটি ঘুরঘুর করে উঠে; আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, "আপনি বুঝবেন না, পণ্ডিতমশাই, তার সাধ আহ্লাদ পূরণ করতে আমি কোন কসুরই করি নি; তার কি পরিণাম এই। আমাকে এড়িয়ে চলবে সে?"

উত্তরে বলি, "এড়িয়ে চলবে কেন? আচ্ছা, নিশ্চয়ই আপনাদের ছেলেপিলে হয় নি?"

তিনি বলেন, "না হয় নি। তার কোন সম্ভাবনা আর আছে কি?

আমি উত্তর দেই, "না, দু'জনেরই সন্তানভাব বড় দুর্বল। তবু এখনও সময় আছে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, "তাহলে ভালই হ'ত পণ্ডিতমশাই, বড় একা একা থাকে। সবই বুঝতে পারি। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে ত? বরাবরই লেখাপড়ার দিকে ভারি ঝোঁক। কিন্তু এই লেখাপড়াই সর্বনাশ করেছে; এই দেখুন—।"

ভদ্রলোক তাঁর ব্যাণ্ডেজবাঁধা ডান-হাতখানি তুলে ধরে বললেন, "এই দেখুন তার কাণ্ড! নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে? পড়েটড়ে গিয়ে লেগেছে বুঝি?"

তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "পড়ে যাব কেন মশাই? আস্ত পাগল! কামড়ে দিয়েছে মশাই, আমার হাতে কামড়ে দিয়েছে।"

বিস্মিত হই তাঁর কথায়; তবে কি সত্যিই মহিলার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! বয়স ত মাত্র চব্বিশ হয়েছে; ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "কামড়ে দিয়েছে সে? সে আবার কি কথা?"

তিনি বললেন, "দোতলা থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়তে যাচ্ছিল, ছুটে গিয়ে ধরে ফেললাম। তা না হ'লে কাল রাত্রেই সর্বনাশ হয়ে যেতো পণ্ডিতমশাই। কিন্তু দুপাটি দাঁত বসিয়ে দিলে—এই, এই কব্জিটার উপর।"

কৌতূহল চেপে রেখে সহানুভূতির সুরে বলি, "আহা-হা, নিশ্চয়ই খুব লেগেছে; আচ্ছা, কি হয়েছিল বলুন ত?"

তিনি বললেন, "হবে আর কি? রাত দুটো পর্যন্ত কেবল পড়ছে ত পড়ছে, লিখছে ত কেবল লিখছে। ঘুমোতে পারি নি মশাই; নিশ্চিন্দি ঘুমোবার জো নেই। সারাদিন খেটেখুটে আসি। তার উপর এই জ্বালা। কত আর সহ্য হয় বলুন ত?"

আমি উত্তর দেই, "নিশ্চয়ই। ঘরে একজন আলো জ্বেলে বসে থাকলে কি আর ঘুম হতে পারে? আচ্ছা, তিনি কি এত লিখ্‌ছিলেন, লেখাটেখার অভ্যাস আছে বুঝি? না চিঠিপত্র?"

তিনি হেসে উত্তর দেন, "না, না মশাই, পরীক্ষার পড়া তৈরী হচ্ছে। এবার আই-এ দেবে কি না?"

আমি উত্তর দেই, "ওঃ, তিনি বুঝি কলেজে পড়েন?"

আক্ষেপের সুরে ভদ্রলোক বলে ওঠেন, "নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি পণ্ডিতমশাই, বছর তিনেক আগে ম্যাট্রিক দিয়েছে। বিয়ের পাঁচ-সাত বছর কেটে গেছে; ছেলে-পিলে হয় নি; পড়াশুনায় ঝোঁক আছে; ভাবলাম ম্যাট্রিকটা দিয়ে ফেলুক। সত্যভামা স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রীকে প্রাইভেট মাষ্টার রেখে ছিলাম; বেশ ভালভাবেই পাশ করলে।"

আমি বললাম, "ভালই করেছেন। তারপর কি হল?"

তিনি বললেন, "ম্যাট্রিক পাশ করার পর থেকেই ওর মাথায় পোকা ঢুকেছে—কলেজে পড়ব, কলেজে পড়ব ; রাতদিন এই এক বুলি।"

তাঁর কথায় হাসি পায় ; বললাম, "তারপর বুঝি কলেজে ভর্তি করে দিলেন।"

ভদ্রলোক বললেন, "না দিয়ে আর উপায় কি? ডাটন কোম্পানীর নাম শুনেছেন ত? বড় কাঠের ব্যবসায়ী! আমারই সে কারবার। আমার আর সময় কোথা? বাড়ীতেই বা থাকি কতক্ষণ! তাই নানা দিক ভেবে কলেজেই দিলাম ভর্তি করে!"

আমি বললাম, "তা এখন পরীক্ষার সময় একটু বেশি পড়াশুনা করবেন বৈ কি!"

তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কেন, আমরা কি আর লেখা পড়া করি নি? পাশ যে করতেই হবে, তার ত কথা নেই। চাকরী করতে হবে না, সময় কাটাবার জন্যেই পড়াশুনা।"

হেসে উত্তর দেই, "আপনার পক্ষে তা হতে পারে ; কিন্তু আপনার স্ত্রীর হয়ত তাতে ঝোঁক এসে গেছে ; লেখাপড়ার নেশা বড় প্রবল নেশা মশাই।"

তিনি বললেন, "কি হবে পণ্ডিতমশাই? কি কাজে ওর লেখাপড়াটা লাগবে শুনি? আমি দু-দুবার ম্যাট্রিক ফেল করেছি, তাতে আমার কি এসে গেছে! আমাদের যা ব্যবসা, তাতে তার বেশি কিছু লাগে না।"

আমি বললাম, "তিনি ত আর আপনার ব্যবসায়ে নামছেন না! ছেলেপিলে যখন নেই লেখাপড়ার চর্চা করাটা ভাল।"

ভদ্রলোক বললেন, "সবই ভাল ; কিন্তু এখন আমাকে যেন আর মানতে চায় না ; এড়িয়ে থাকতে চায়। রাতদিন কেবল পড়া আর পড়া। লেখাপড়া শিখে মাষ্টারী করবে—।"

আমি বললাম, "পড়তে দিন, দেখুন না কি হয় ?"

তিনি বললেন, "মাথাটা বিগড়ে গেছে পণ্ডিতমশাই, রাত দুটো পর্যন্ত কি এত পড়তে হয় ? আর আজকালকার বইটইগুলোও বেশ ভাল নয় বলে মনে হয়, বিশেষ করে এগুলো মেয়েদের মন বিগড়ে দেয়।"

"কেন বইগুলো কি দোষ করলে ?"

"আপনি তা জানেন না বুঝি ? কি করেই বা জানবেন ? যত সব কু-আদর্শ, যত সব ঘর ভাঙ্গার গল্প।"

তার কথা শুনে হেসে উঠলাম ; তাঁকে বললাম, "এরকম বইত আর পাঠ্য পুস্তক হতে পারে না। আর আপনার স্ত্রীর ত এখন বয়স হয়েছে ; জ্ঞানও হয়েছে। ভয় কিসের ?"

তাঁর চোখ দুটি ঘুরঘুর করতে লাগল ; তিনি বলে উঠলেন, "বয়স হয়েছে কি পণ্ডিতমশাই ? এই ত কাঁচা বয়েস। দেখতে পান না—কলেজে, রাস্তায় ঘাটে কি সব মেয়ে আজকাল চলাফেরা করে ? তাদের বয়সের কি গাছপাথর আছে ?"

আমি উত্তর দেই, "দেখতে পাই বৈকি ? তাতে কি হয়েছে ?"

"কি আবার হবে ? ওরও সে ব্যাত্তিকে ধরেছে। ওই সব মেয়ের কি আর লজ্জাসরম আছে পণ্ডিতমশাই ? ব্যাটাছেলেদেরও তারা হার মানিয়ে দেয়।"—উত্তেজিত তাঁর কণ্ঠস্বর।

আমি হেসে বললাম, "যে কালের যে ধর্ম, তাতে ক্ষতি কিছুই নেই।"

তিনি বলে ওঠেন, "ক্ষতি নেই? আমার যে ঘর ভাঙ্গতে বসেছে!"

উত্তর দিলাম, "এখন আর ভেবে কি হবে? কলেজে পড়তে দিলেনই বা কেন?"

"অতশত ভাবি নি পণ্ডিতমশাই, কাঠের কারবারীর ধাতে এ সইবে কেন? বড় ভুল করে ফেলেছি।"

"দেখুন, আপনার স্ত্রীর কোষ্ঠীটা ভাল মনে হচ্ছে; লেখা-পড়ার যোগও প্রবল। যখন এতদূর এগিয়েছেন, তখন পড়তে দেওয়াই ভাল।"

"আমি ত তাই করেছিলাম, কিন্তু এখন তার হালচাল দেখে মনটা বড় দমে গেছে পণ্ডিতমশাই!"

"রাত জেগে পড়াশুনা করতে দিতে আপনার আপত্তি কেন?"

"না, না, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ইদানীং বড় অন্য-রকম ঠেকছে। আমার সঙ্গে বের হতে চায় না। আমি কলেজে এগিয়ে দিয়ে আসব, তাতেও আপত্তি। ওর মনটা যাতে চাঙ্গা থাকে, তার জন্যেই এ সব। কাজকারবারের ক্ষতি করেও তাকে একটু সোয়াস্তি দিতে চাই আমি। মাঝে মাঝে মাঠে বেড়ানো, কিংবা সিনেমা-টিনেমা দেখা।"

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম; চোখ দুটো যেন সব সময়ই ঘুরঘুর করে; দাঁতে জিভ ঠেকে কথা বলার সঙ্গে

নেপথ্যে একরকম আওয়াজ করে উঠে; তাঁকে বললাম, "এ আপনার বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কেন, তিনি ত একাই কলেজে যেতে পারেন?"

"তা পারেন বটে, তবে কি না, আজকালকার ছেলেছোকরা-দের বিশ্বাস নেই—মেয়েদের সম্মান রেখে কথা বলতে জানে না; আর ট্রামে-বাসে যা ঘেঁষাঘেঁষি! তাই রিক্সা করে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করি।"—ভদ্রলোক মাথা চুলকাতে লাগলেন।

হেসে উত্তর দেই, "তিনি হয়ত আপনার কাজকর্মের ক্ষতি হোক, তা চান না।"

তিনি বললেন, "ক্ষতি আর কি হবে? সব দিক বজায় রাখতে হবে ত? সে চায় না, আমি তার কলেজ পর্যন্ত যাই, আমাকে যেন এড়িয়ে থাকতে চায়।"

আমি বললাম, "ভাল কথা, কেনই বা আপনি কলেজ পর্যন্ত যাবেন? আপনার ত একটা মানমর্যাদা আছে।"

তিনি বললেন, "সে কথা একশোবার স্বীকার করছি; সবাই হাসাহাসি করে এটাও দেখতে পাই! আচ্ছা, ওর মাথার গোলমালের কোন ভয় নেই ত?"

আমি উত্তর দেই, "না, না, কোন ভয় নেই; তবে, মাথার গোলমাল একটু হয়েছে বই কি? দেখুন ওকে বেশী উত্ত্যক্ত করতে যাবেন না।"

তিনি বললেন, "না, না, উত্ত্যক্ত করতে যাব কেন? তার যাতে ভাল হয়, আমি তাই-ই চাই। কাল রাত থেকে কেবল কাঁদছে; প্রায়ই দেখি, একা একা বসে আনমনা হয়ে কি

ভাবছে! আমাকে এড়িয়ে থাকতে চায়! তাহলে রাজযোটকের মাহাত্ম্য আর রইল কোথায় পণ্ডিতমশাই!”

হেসে উত্তর দেই, “রাজযোটক ঠিকই আছে; তিনি যে আপনাকে ভালবাসেন না, তাও নয়! সাময়িক উত্তেজনার জন্যেই এরকম হয়েছে।”

তিনি বললেন, “তা বুঝি পণ্ডিতমশাই, নিজে হাতে গড়ে মানুষ করেছি তাকে, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কিই বা জানত, আর কিই বা দেখেছে, কলকাতায় নিয়ে এসে রাজরাণী বানিয়ে দিয়েছি।”

আমি হেসে উত্তর দেই, “আমার মনে হয়, আপনি একটু ভুলও করেছেন; সে ভুল শুধরাবার আর কোন উপায় নেই। লেখাপড়া শিখে মহিলাটির রুচিও বদলে যাচ্ছে।”

মাথা নেড়ে তিনি উত্তর দেন, “ঠিক বলেছেন পণ্ডিতমশাই, রাজযোটকের আর দোষ কি?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ, আপনি ত আর তালে তালে পা ফেলে চলতে পারছেন না; চিরকেলে প্রথায় দোকান-পশার খদ্দের নিয়েই আপনি চলেছেন। আর তিনি শিক্ষায়-দীক্ষায় আদর্শের দিক থেকে অনেকখানি এগিয়ে চলেছেন।”

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বললেন, “ঠিক কথা বলেছেন আপনি; আমি আর টাল সামলাতে পারছিনে; সত্যভামার সেই শিক্ষয়িত্রীই আমার সর্বনাশ করে গেছে; রাজযোটক ভেঙ্গে দেবার মন্ত্র পড়ে গেছে সে; কলেজে পড়ার বাতিক সেই ত ধরিয়ে গেছে।”

সান্ত্বনার সুরে বলি, “ভয় নেই, কোন বাধা দেবেন না; তাঁকে মনের সাধে পড়াশুনা করতে দিন, ভালই হবে।”

তিনি আক্ষেপ করে বলে উঠলেন, “তাতে আর কি ভাল হবে পণ্ডিতমশাই?”

আমি হেসে উত্তর দেই, “পাগলামির হাত থেকে রক্ষা পাবেন আপনি! বুঝলেন?”

“বুঝেছি সবই; আর আমার কোন উপায় নেই। নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি; আমাদের রাজযোটক ভাঙ্গতে বসেছে।”

দরদর করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তাঁকে কি বলব ভেবেই পাই নে; শুধু আশ্বাস দেই, “ভয় নেই; তাঁর কোষ্ঠী ভাল; তাঁকে আর উত্যক্ত করবেন না।”

“তাই করব পণ্ডিতমশাই।”—ভদ্রলোক চলে গেলেন; সত্যই তিনি নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছেন।

দৈবপ্রাপ্তি

"হেঃ, হেঃ, আপনি পণ্ডিতমশাই।"

"হ্যাঁ, আমিই।"

সামনে এসে দাঁড়ালেন এক ভদ্রলোক; আর তাঁর সঙ্গে একজন মহিলা।

"নমস্কার, নমস্কার, হেঃ হেঃ, আমি যা মনে করেছিলাম, তা দেখছি ভুল; নিতান্ত অল্পবয়সী আপনি। আর সে রকম বেশভূষাও নেই; হেঃ হেঃ, (পাশের দাঁড়ান মহিলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন) আমি তোমায় বলেছিলেম কি না?—এঁরই কথা।"

"বসুন, আপনারা।"

ভদ্রলোকের হাসির ধরনটাই এ রকমের; পরে বুঝলাম, এটা একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে। হাসি আসে না, তবু হেঃ হেঃ করা চাই; জিজ্ঞাসা করলাম, "কি জন্যে এসেছেন বলুন?"

ভদ্রলোক উত্তর করলেন, "কাজেই এসেছি; তাহলে দেখছি, অল্পবয়সেই আপনি,—হেঃ হেঃ।"

"নেহাৎ অল্প মনে করবেন না; আচ্ছা, আপনার বয়স কত হল?"

বিজ্ঞের মত গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন, "এই তেতাল্লিশ হল।"

হেসে উত্তর দিই, "তাহলে আপনি আমার চেয়ে বারো-তেরো বছরের ছোট।"

"কি বললেন ? বিশ্বাস হয় না।"—কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি হঠাৎ উপুড় হয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, "তাহলে নিশ্চয়ই আপনি যোগীপুরুষ ; আমিও তা অনুমান করেছিলাম ; (মহিলার প্রতি) কি গো, বলিনি ? আপনিই পারবেন, আমায় নিরাশ করবেন না।"

"এ কি করছেন ? আমার পা ছাড়ুন ; বলুন, আপনাদের কি দরকার।"

এবার মহিলাটি উত্তর দিলেন, "দেখুন পণ্ডিতমশাই, নিশ্চয়ই ওঁর মাথা খারাপ হয়েছে ; তা না হলে কেউ এরকম করে ?"

ভদ্রলোক বললেন, "মাথা খারাপ হয়েছে তোমার না আমার ?" আমি ঠিক জায়গায়ই এসেছি। আপনি আমায় আগে কথা দিন। আমায় ছলনা করবেন না, পণ্ডিতমশাই।"

"আপনি উঠে বসুন ত আগে। আমরা জ্যোতিষী ; জ্যোতিষশাস্ত্রে যা বলে, তাই নিয়েই আমাদের কারবার ; কি উপকার আপনাদের করতে পারি আমি ?"

ভদ্রলোক করজোড়েই উঠলেন ; বেশ মোটাসোটা চেহারা ; মাথায় টাক আছে ; গায়ে গলাবন্ধ কোট ; চোখে চশমা। তেতাল্লিশেই তেষট্টির ধকল দেখা দিয়েছে চোখে-মুখে। আর মহিলাটিও চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁচেছেন বলে মনে হল ; আঁট-সাঁট দেহখানি ; তবুও মুখে একটা কমনীয় ভাব আছে ; পরনে

একখানি সাধারণ শান্তিপুরী শাড়ী। মহিলাটি বললেন, "ওঁর কোষ্ঠীটা দয়া করে দেখুন ত পণ্ডিতমশাই।"

ভদ্রলোক বললেন, "আর ইনি ; বুঝতেই পারছেন, আমরা স্বামী ও স্ত্রী। ওঁর কোষ্ঠী নেই, হাতটা দেখতে হবে। হেঃ হেঃ। ঠিক সময় বুঝেই এসেছি ; বরাতটা ভাল ; তাই আপনাকেও ধরতে পেরেছি।"

ময়লা কাপড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে ভদ্রলোক প্রায় আড়াই সের ওজনের একখানি কোষ্ঠী আমার হাতে দিলেন ; তাঁর কোষ্ঠী খুলতে লাগলাম ; বাব্বা। কত বড় কোষ্ঠী।

মহিলাটি সসংকোচে বললেন, "ওঁর কোষ্ঠীই দেখুন, আমার হাত দেখে আর কি হবে ?"

ভদ্রলোক বললেন, "দেখতে হবে বৈ কি ? কার বরাতে কি আছে কে জানে ? হেঃ হেঃ আমরা রামেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান কি না। আমার বাবার ঠাকুরদা ছিলেন মস্ত বড় পণ্ডিত ; কত যজমান-শিষ্য রয়েছে আমাদের ; কোষ্ঠীখানা করেছিল রামভুজ আচার্যি ; যে মৃত্যুর দিন-ক্ষণ-তিথি নির্ভুল বলে দিতে পারত।"

"তাহলে আমার কাছে আবার এটা নিয়ে আসা কেন ? কোষ্ঠীতে ত সবই লেখা রয়েছে।"

"হেঃ হেঃ ! একটা কথা আছে না, যার কর্ম তারে সাজে। তাইত আপনার কাছে এসেছি ; এসব সংস্কৃত টংস্কৃত আমার আসে না ; পাঁচ বছর বয়স থেকে পূজা আর যজমান নিয়েই ব্যস্ত ; লেখাপড়া করবার ফুরসত আমার কোথায় ? তার

উপর বারো পার হতে না হতে আমার ঠাকুরদা মশাই সখ করে নাতবৌ ঘরে নিয়ে এলেন। হেঃ হেঃ।"

ভদ্রলোক মহিলাটির দিকে কটাক্ষ করে আবার হেসে নিলেন। আমি কোষ্ঠী দেখতে লাগলাম ; হ্যাঁ কোষ্ঠীই বটে। এত চিত্র-বিচিত্র ! মুক্তোর মত অক্ষরগুলি ! দৈর্ঘ্যে কুড়ি-পঁচিশ হাতের কম হবে না। ভদ্রলোককে বললাম, "এখন ত রাহুর দশা, শরীরটা মাঝে মাঝে খারাপ গেলেও ধন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।"

"ধনবৃদ্ধিতে আর কি হবে মশাই ! এত খাটতে আর পারিনে ! পিতাঠাকুর বলতেন, আমার কোষ্ঠীতে নাকি দৈব-প্রাপ্তির যোগ আছে, আর আমার ইনি নাকি হবেন রত্নগর্ভা।"

"যোগ থাকলে নিশ্চয়ই ঘটবে।"

"আর এদিকে যে আমার প্রাণান্ত ! বছর বছর লটারির টিকিট কিনে যাচ্ছি ; কই, কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছিনে।"

"কেন, এমন করছেন ? যোগ থাকলে ঠিক সময়ে লেগে যাবে ; আর দৈবপ্রাপ্তি বলতে কত কি বুঝায়।"

এবার মহিলাটি বললেন, "ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশাই, কে বুঝাবে বলুন ; তোমার বরাতে থাকে আপনি হবে ; তার জন্য বছরে ছবার করে লটারির টিকিট কেনা আর খেলার দিনে কালীঘাটে পূজো দেওয়া ! নিজের ত মাথা খারাপ হয়েছে ; এখন বাড়ীশুদ্ধ সকলকে অস্থির করে তুলেছেন ; যত সব ভাঙ্গা বাড়ী খুঁড়ে খুঁড়ে মরছেন।"

কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "ভাঙ্গাবাড়ীতে খুঁড়াখুঁড়ির ব্যাপারটা বুঝতে পারছি নে।"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "হেঃ হেঃ, বুঝলেন না, মাটির তলা থেকেও কোন দৈবধন আসতে পারে। কেউ হয়ত মাটির তলায় কিছু পুঁতে রেখেছে, ভোগে আসে নি।"

মহিলা বললেন, "কোন্ এক হারান-পণ্ডিত ওঁর মাথায় এটা ঢুকিয়ে দিয়েছে; সাত-সাতবার বাড়ী বদল করেছেন; পুরনো আমলের যত সব ভাঙ্গা বাড়ী। এরপর চলে মেঝে খুঁড়া। তারপর আসে বাড়ীওয়ালার তড়পানো;—সিমেণ্ট, বালি, ইঁট! জ্বালাতন আর কি?

ভদ্রলোক বললেন, "চেষ্টা করতে হবে না? দৈব কি এমনি আমার হাতে তুলে দেবে।"

ব্যাপারটা শুনে বিস্মিত হলাম! দৈবের আশায় ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম, "এখন আছেন কোথায়?"

"আরে মশাই, ঠিক জায়গায়ই গিয়ে পড়েছি। রাজবলপুরের নাম জানেন ত? খুব কাছেই; বড় বড় সব পুরনো আমলের বাড়ী ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে; তারই একখানি নিয়েছি; ভাড়াও খুব কম। চারধারে ফুঁড়ে উঠেছে শাল আর বটের গাছ; সাপ-শেয়ালের ভয়ে সেখানে কেউ ঘেঁষে না; কিন্তু মশাই, আপনাদের ওই রিফুইজিদের জ্বালায় সেখানেও টেঁকা দায়।"

মহিলাটি বললেন, "ওখানে আবার মানুষে বাস করে?

আমি ঠিকই বলছি তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমরা কিছুতেই সেখানে যাব না।"

ভদ্রলোক বললেন, "তা যাবে কেন? ছেলের পালক গজিয়েছে কি না?—রত্নগর্ভার রত্ন।"

বাধা দিয়ে বললাম, "দেখুন মশাই, আপনি ভুল পথে চলেছেন; দৈবপ্রাপ্তি বলতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু প্রাপ্তি বুঝায়, চেষ্টা করে দৈবকে পাওয়া যায় না।"

তিনি বললেন, "আপনি কি বলতে চান, এ রকম করে কিছুই পাওয়া যাবে না! আমি ত মনে করেছি, আপনাকে নিয়ে গিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে আনব।"

বিস্মিত হয়ে উত্তর দেই, "কেন, আমি কি করব?"

আবার সেই কণ্ঠে "হেঃ হেঃ, শুধু কোন্ জায়গায় ধনটা পোঁতা আছে, আন্দাজ করে বলতে হবে।"

উত্তর দেই, "আগেই বলেছি, ভুলপথে আপনি চলেছেন; আচ্ছা পৈতৃক ছাড়া আর কারো কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু পেয়েছেন কি? ধরুন, কোন আত্মীয়ার সম্পত্তি, যেমন মাসি, পিসি কিংবা শাশুড়ীর।

"না, না, এরকম ত কেউ নেই আমার।"

"আচ্ছা ছত্রিশ বর্ষ বয়সে একটা সম্ভাবনা ছিল দেখা যাচ্ছে।"

"হেঃ হেঃ, কেটে গেছে নাকি? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমার এক পিসিমা কাশীবাসী হয়েছিলেন। সকলের ধারণা ছিল, তাঁর হাতে অনেক টাকা আছে। টেলিগ্রাম পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে কাশী

গেলাম। পিসিমা বেটী আমি পৌঁছবার আগেই আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। তাঁর আঁচল থেকে ষোল "টাকা সাড়ে নয় আনা পাওয়া গেল ; শ্রাদ্ধশান্তি আর গাড়ীভাড়ায় আমার কিন্তু খরচ হল সাড়ে ছেচল্লিশ টাকা! হায়রে কপাল! আর শাশুড়ীর কথা বলছেন, তাঁর ছয়টি ছেলে আর সাতটি মেয়ে আমার ওই রত্নগর্ভা ব্রাহ্মণীকে নিয়ে।"

ব্রাহ্মণী বললেন, "কোন কাজ করবেন না, ওঁকে সবাই দিক্। কত আর দেবে। মাথায় ঢুকেছে দৈবপ্রাপ্তি।"

আমি বলি, "দেখুন মশাই, শিষ্য যজমান আছে ; তাই নিয়েই থাকুন ; ছেলেটি মানুষ হলে আপনার আর চিন্তা কি?"

তিনি বলেন, "রত্নগর্ভার ছেলে কি না,—কলেজে পড়েন ; শিষ্য যজমান ঠাকুর দেবতার ধারও ধারে না।"

ব্রাহ্মণী বললেন, "কি করবে তোমার শিষ্য যজমান? লেখা-পড়া করে চাকরী করবে, বাঁধাধরা আয় ; ছেলে আমার ভাল পণ্ডিতমশাই, বৃত্তি পেয়েছে ম্যাট্রিকে।"

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ ; বড়লোক মামা রয়েছে কি না? ভাঙ্গাবাড়ীতে থাক্‌তে চান না? দিক্ না কেমন একখানা বাড়ী করে?"

ব্রাহ্মণী বললেন, "কেন দেবে? তোমার ত এত ছিল ; তার কি করলে? শুধু দৈবধন আর দৈবধন? আমার ছেলে মানুষ হলে কোন ভাবনাই থাকবে না।"

ভদ্রলোক বললেন, "চাকরী করবে না আমার মাথা রক্ষা করবে! দৈব দয়া না করলে কি মানুষের ভাগ্য ফেরে মশাই?"

চাকরীতে আর কত রোজগার হবে? তা বুঝি—যদি হয় বড় ব্যারিষ্টার না হয় মন্ত্রীটন্ত্রী।"

আমি উত্তর দেই, "আপনার ছেলে যে এরকম কিছু হবে না, তা জানেন কি করে? আমার ত মনে হয়, আপনার পুত্রভাগ্য ভাল।"

আমার কথা শুনে মহিলাটির মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; গর্বের সঙ্গে তিনি বললেন, "আমার দাদাও তাই বলেন; ছেলেকে আইন পড়াবেন।"

ভদ্রলোক বললেন, "বেশ, বেশ, তোমরা ভাইবোনে মিলে যা করবার কর। বলি, দৈব না দিলে ওই ব্যারিষ্টারী পড়ার খরচটা আসবে কোত্থেকে?"

তাঁর কথায় হাসি পেয়ে গেল, তাঁকে বললাম, "ঠিক কথা, দৈব সহায় বৈকি? ছেলে স্কলারশিপ পেয়েছে। মামা পেছনে আছেন; দৈবই আপনাকে সাহায্য করছে।"

ভদ্রলোক অধীর হয়ে বললেন, "তা হলে আমার কোষ্ঠীর কথাটা কি মিথ্যে?"

আমি উত্তর দেই, "মিথ্যে হতে যাবে কেন? পিসিমার টাকাটাও দৈবপ্রাপ্তি বলতে হবে; আর ছেলে পাচ্ছে দৈবের সহায়তা।"

ভদ্রলোক বললেন, "কি বলতে চান আপনি? আমার কোষ্ঠীতে কি দৈবপ্রাপ্তির যোগ নেই? যদি থাকে ত কখন সেটা ঘটতে পারে?"

হেসে উত্তর দিই, "অত ভাবনা কেন তার জন্যে? দৈবের

উপর কি গণনা করা চলে। দৈব ত জ্যোতিষীর নাগালের বাইরে, তার দিনক্ষণ পাঁজির পাতায় ধরা পড়ে না। আপনি ত পণ্ডিতের সন্তান, একথাটা বুঝেন না? দৈব অনুগ্রহ না করলে সমস্ত পৃথিবীটা খুঁড়ে ফেললেও পোঁতা ধনের সন্ধান পাবেন না।"

ভদ্রলোক বললেন, "তা হলে ওই রাজবলপুরের বাড়ীটা?"

আমি বললাম, "ছেড়ে দিন। ভুলপথে চলেছেন আপনি। এটা বোঝেন না, দৈব যদি দেয়, তার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। আপনাআপনি তা ঘটে যাবে। হেলায়-ফেলায় হয়ত কোন দিন লটারির টিকিট কিনেছেন, মনেই নেই; হঠাৎ দেখলেন, টেলিগ্রাম এসেছে।"

আমার কথায় ভদ্রলোক হকচকিতের মত বলে উঠলেন, "তাহলে চেষ্টা করব না?"

দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেই, "না, না, এরকম করে দৈবের পেছনে ছুটলে মানুষ পাগল হয়ে যায়।"

মহিলাটি এবার অর্থপূর্ণ হাসিতে বলে উঠলেন, "তার আর বাকি আছে কোথায়? কিগো, শুনলে ত? চল এখন, আর ওই ভাঙ্গা বাড়ীর নামও করো না। মাথায় ভূত চেপেছে।"

ভদ্রলোক নিরুৎসাহ হয়ে বললেন, "ঠিক কথাই বলেছেন পণ্ডিত-মশাই, দৈবে দিলে আপনিই আসবে।"

আমি বললাম, "হাঁ, হাঁ, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যান; বরং ছেলের দিকে নজর দিন; কাজকর্ম করুন।"

ভদ্রলোক বললেন, "তাই করবো পণ্ডিতমশাই, আমাদের

হারান-খুড়োই মাথায় ঢুকিয়ে দিলে কি না মাটির তলায় পোঁতা ধন পেতে পারি।"

তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বলি, "হাঁ, পেতে পারেন। কিন্তু তার জন্যে কি মাটি খুঁড়ে ঘুরে বেড়াবেন? যদি ঘটে ত আকস্মিকভাবে ঘটবে। চেষ্টা যদি করবেন, তা হলে দৈবের আর মাহাত্ম্য রইল কোথায়?"

ভদ্রলোক যেন আমার কথা বুঝতে পারলেন; তিনি বললেন "ঠিক কথাই বলেছেন, চেষ্টা যদি করতে হয় দৈবের আর মাহাত্ম্য রইল কোথায়? তবুও মাঝে মাঝে লটারির টিকিট কিনতে ত বাধা নেই? কি বলেন?"

ভদ্রলোক মাথা চুলকাতে লাগলেন; যেন আমার অনুমতির উপরই সব নির্ভর করছে। এদিকে ভদ্রমহিলার চোখে অনুনয়ের দৃষ্টি। কোষ্ঠীখানি তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, "তাই করবেন; কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না; দৈব আবার বিগড়ে যেতে পারে; রাহুর দশা কি না?"

ভদ্রলোক আমার কথায় চমকে উঠলেন, "তাইত। রাহুটা পিশাচ বটে, ব্রাহ্মণকে তার সইবে কেন? বড় উপকার করলেন আপনি; ঠিক কথাই মনে করিয়ে দিলেন।"

"আচ্ছা আসি নমস্কার—।" তাঁরা দুজনেই বিদায় নিলেন; ভদ্রলোক কিন্তু বিড় বিড় করে বলতে বলতে চললেন, "রাহুটা পিশাচ—ঘাটাঘাটি করলে দৈবকে বিগড়ে দিতে পারে।"

হাসি পায় তাঁর কথায় ; নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।

সকালবেলা ঝাড়া দু'ঘণ্টা ভদ্রলোক উত্যক্ত করে গেলেন। উস্কখুস্ক চুল, কাঁচাপাকা দাড়ি, মোটাসোটা গোলগাল চেহারা ; বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। গুন্ গুন্ করে আপন মনে গান করছেন কি জপ করছেন কিছুই বুঝা যায় না।

ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন, "আপনি বুঝি পণ্ডিতমশাই ? বেশ, বেশ ; আচ্ছা বলুন ত আমাকে দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে ?"

প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে উঠলাম, ইনি আবার কে ? আমাকে কি পরীক্ষা করতে এসেছেন ? উত্তর দিলাম, "কি আবার মনে হবে ? আপনি প্রবীণ ভদ্রলোক।"

মুখে তাঁর বিজ্ঞের মত হাসি ফুটে উঠল ; দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "নাঃ, আপনিও ধরতে পারলেন না ; আর কি করেই বা পারবেন ? আচ্ছা, ভাল করে দেখুন, কিছু দেখতে পান কি ?"

অদ্ভুত তাঁর প্রশ্ন। দেহের গঠন ও আকৃতি-প্রকৃতি দেখে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যায় বটে কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ। তাঁকে বললাম, "দেখুন আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে ; ঠিকুজী-কোষ্ঠী বিচার করতে পারি ; হাত দেখেও কিছু বলতে পারি। কিন্তু এভাবে কিছুই বলা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

এবার ভদ্রলোক সশব্দে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন; তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকুজী-কোষ্ঠী দেখবেন বৈকি? হাতও দেখাব। আচ্ছা, তার আগে খুব ভাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন ত?"

কি আর দেখব? গোলগাল মুখখানা, নাক একটু চেপ্টা-গোছের; কপালটা প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া; কপালে সাদা চন্দনের ছাপ; মাঝখানে লাল চন্দনের বড় একটা ফোঁটা। ভদ্রলোককে নিতান্ত সহজ সরল বলেই মনে হয়। আমি চুপ করে তাকিয়ে রইলাম। সন্দেহ জেগে উঠল, ভদ্রলোক আবার হিপনোটিজম্ জানেন না কি?

তিনি বললেন, "কি? কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি? কোনরূপ আলো কিংবা জ্যোতি? মুখখানা ঘিরে রয়েছে কিংবা মুখ থেকে বের হচ্ছে?"

আমি বললাম, "না, এরূপ কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি নে।"

বিদ্রূপের সুরে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "তা দেখতে পাবেন কি করে? জ্যোতিষী করেন, জ্যোতির সন্ধান ত রাখেন না?"

ভদ্রলোকের কথায় বিস্মিত হলাম; তিনি কি বলতে চান যে, তাঁর মুখমণ্ডল থেকে জ্যোতি বের হচ্ছে? প্রকাশ্যে বললাম, "দেখুন আমরা ঠিকুজী-কোষ্ঠীই দেখি, জ্যোতির সন্ধান পাব কোথা?"

ভদ্রলোকের মনে যেন করুণার সঞ্চার হল; তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বলুন; জ্যোতির সন্ধান আপনি পাবেন কোথা? তবুও আমি নিজেই যখন এসে পড়েছি, তখন আপনার বুঝা

উচিত ছিল; আমি ত যার তার কাছে যাই না; চেষ্টা করেও আপনার চোখ ফোটাতে পারলাম না; এখনও সময় লাগবে। আচ্ছা এই ছকটা দেখুন ত?”

“তিনি ছোট্ট একখানি ঠিকুজি আমার হাতে দিলেন; আমি তা দেখতে লাগলাম; তিনি আপন মনে গুন্‌গুন্ করতে লাগলেন। ভদ্রলোকের কথাবার্তা আমার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকছে; ভদ্রলোক কি বলতে চান?”

কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, “লগ্নে রবি, চন্দ্র, বুধ ও কেতু রয়েছে না?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ, রয়েছে; তার উপর চতুর্থে মঙ্গল; সংসার-সুখে বাধা জন্মাবে।”

তিনি বললেন, “সংসার-সুখ জিনিসটা কি বলতে পারেন? কই, আমি ত দিব্বি আছি; আপনারা বলেন, রন্ধ্রগত শনি; তাও আমার রয়েছে। ছুই গুরু আছে দ্বিতীয়ে, এ রকম কোষ্ঠী কার হতে পারে?”

আমি বললাম, “এই ত আপনারই বলছেন এ কোষ্ঠী।”

তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আমারই; কিন্তু সংসার দিয়ে আমি করব কি? সমস্ত সংসারটাই আমি ভাবি আমার। কিন্তু কেউ আমাকে বুঝলে না, এটাই আমার দুঃখ—তাই ত আপনার কাছে এসেছি।”

“আপনার কোষ্ঠীর যোগাযোগগুলো ভাল নয়; সংসার-জীবনে শান্তি পাওয়া শক্ত। এটাই মনে হচ্ছে।”

“না, না, সংসারী লোকের উপকার আমি করতে চাই;

লোকের জন্যই আমার আসা, কিন্তু কেউ ত আমায় নিতে চায় না।"

ভদ্রলোকের কথা বুঝতে পারি না; তিনি কি যে বলতে চান বুঝিও না। সোজাসুজি বললাম, "আচ্ছা আপনি বিবাহ করেছেন?"

তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই; কিন্তু মশাই, তাতেই গোল বেধেছে; সে-ই আমাকে স্বীকার করতে চায় না।"

আমি বললাম, "সে আবার কি কথা?"

তিনি বললেন, "ভাল করে দেখুন, আমার কোষ্ঠীর সঙ্গে আর কারো কোষ্ঠীর সাদৃশ্য আছে কি না? এই কুম্ভ লগ্ন আর অষ্টমে শনি!"

হঠাৎ মনে পড়ে গেল একজন মহাপুরুষের কথা। কিন্তু পত্নীস্থানে রাহু রয়েছে সাদৃশ্য কোথায়?

তিনি বললেন, "মনে পড়ছে না? আপনাদের শ্রীশ্রীপরমহংস-দেবের কথা?"

এই কথাটাই আমার মনে জেগেছিল; কিন্তু রাহুই গোল বাধিয়েছে। আমি বললাম, "রাহুর জন্যেই সব বিগড়ে গেছে।"

তিনি বললেন, "আমিও একটু-আধটু জানি মশাই, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান আমরা, আমার ঠাকুরদা বলতেন, 'এ ছেলে মহাপুরুষ হবে'।"

আমি বললাম, "বেশ আপনাকে ত ভাল বলেই মনে হচ্ছে।"

তিনি বললেন, "এত মিল থেকেও রাহু গোল বাধাবে, তা হতে পারে না। সাধন-ভজন অনেক কিছু করেছি। অনেক ভাল ভাল কথাও আমি জানি। কিন্তু লোকে গ্রাহ্যই করে না। বড় দুঃখ হয় মশাই, যখন নিজের স্ত্রী বলে বসে পাগল।"

আমি বললাম, "তা বলবে বৈ কি। ভাল কাজে শতেক বাধা।"

তিনি বললেন, "আমি যা ভাবি তাতে জগতের অনেক উপকার হতে পারে। এই যুদ্ধ, মারামারি কাটাকাটি—ওই বোমা-বারুদ সব উড়িয়ে দিতে পারি।"

আমি বললাম, "বেশ, জগতের উপকার করুন। আমরা ত আর পারি না।"

তিনি বললেন, "অমৃতের মন্ত্র নিতে হবে। জগতের সকলের কাছে এ মন্ত্র পৌঁছে দিতে হবে ; তা হলেই সব বিপদ কেটে যাবে।"

বুঝলাম, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ। নিজেকে অবতার-টবতার ঠাউরে বসে আছেন। তাঁকে বললাম, "বেশ ত। আপনার মন্ত্র আপনি প্রচার করুন।"

তিনি হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠলেন, "কার কাছে প্রচার করব মশাই। কেউ নিলে ত। এত সহজ মন্ত্র, কেউ নিতে চায় না, বিশ্বাসও করে না। কলিযুগ কিনা! ধ্বংস হবেই। বড় দুঃখ হয়।"

"নিশ্চয়ই ধ্বংসের হাত থেকে আপনারা বাঁচাতে পারবেন। কাজে যখন নেমেছেন, তখন তা ব্যর্থ হবে না।"

"না, না, ব্যর্থ হবে কেন ? তবে সময় লাগবে। যাঁরা মরে গেছে, তাদের নিয়েই সবাই মাতামাতি করছে, হাজার হাজার বছর আগে বুদ্ধ, কৃষ্ণ কিংবা যীশু এসেছিলেন, তাঁরা সব মরে গেছেন। তাঁদের জোর কি এখন খাটে মশাই। ধরুন না, ওই পরমহংসদেব, তিনিও চলে গেছেন। এখন নূতন লোক চাই।"

তাঁর কথায় কৌতূহল বাড়ে। সায় দিয়ে বলি, "নিশ্চয়ই, গীতায় আছে, যদা যদা হি ধর্মস্য—।"

তিনি বাধা দিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি কথা নূতন করেই তিনি জন্মান ; পুরনো কৃষ্ণ এসে আর কুরুক্ষেত্র ঘটাবেন না। আর দুর্গাও নেমে আসবেন না—দেবতাদের ডাকে।"

আমি বললাম, "বড় ভয় মশাই, ওই অ্যাটম বোমা না হাইড্রোজেন বোমা কি বের করেছে, দু'তিন হাজার মাইল ছারখার হয়ে যায়।"

তিনি দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "ভয় নেই, নিশ্চয়ই একটা বিহিত করব। কিন্তু আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।"

আমি সহাস্যে বললাম, "কি কাজ বলুন ?"

তিনি বললেন, "আর কিছু নয়, শুধু প্রচার—।"

আমি বললাম, "কি প্রচার করতে হবে ?"

তিনি হেসে বললেন, "আমার কথা,—আমার মন্ত্রের প্রচার। আমি নূতন করে সকলের শক্তি নিয়ে এসেছি ; শুধু—এ কথাটা প্রচার হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "আগুন কি কোনদিন চাপা থাকে ?

আপনাআপনি তা একদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। তার জন্যে ভাবনা কি?"

তিনি বললেন, "আপনার কথাই ঠিক; আগুন কোনদিন চাপা থাকে না; কিন্তু বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। জগতের ঘরে ঘরে পৌঁছানো চাই ত? তার আগে যদি কোন বিভ্রাট ঘটে যায়, তা'হলে আমাকে দোষী করতে পারবেন না কিন্তু।"

সহাস্যে উত্তর দেই, "তাহলে বুঝব, নেহাৎ জগতেরই কপাল মন্দ! কিন্তু আপনাদের শক্তির উপর আমার বিশ্বাস আছে।"

তিনি বললেন, "তা ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করব বৈ কি? আচ্ছা, দেখুন ত আমার চন্দ্র আর বুধটা দুর্বল কি না? তাতে নাকি লোক পাগল হয়ে যায়! বাড়ীতে ত টেঁকা দায়, সবাই বলে পাগল। আমার ত কেমন সন্দেহ জাগে তাদের কথায়।"

হাসি চেপে উত্তর দেই, "আরে নাঃ, নাঃ, জগতের মঙ্গল চিন্তায় মনটা চঞ্চল হয় বৈ কি।"

তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, "তারা আমার ক্ষমতা ত জানে না, আর তা বুঝেও না। মৃত্যুভাবস্থ শনিকে শুক্র আর বৃহস্পতি দেখছে; তা কি ব্যর্থ হয়? শাস্ত্রে আছে—গুরু সম্বন্ধেন সম্প্রদায় সিদ্ধিঃ।"

আমি বললাম, "ব্যর্থ হতে যাবে কেন? শুধু রাহুটাই খারাপ করেছে; দেখুন না কি হয়?"

তিনি বললেন, "এদিকে সময় যে ঘনিয়ে এল মশাই, দুনিয়ার যা অবস্থা! আমায় যে পাগল করে ছাড়বে! কেউ আমার কথা শুনে না।"

সহাস্যে উত্তর দেই, "সময় হলে সবাই শুনবে; বলুক না পাগল? ধৈর্য হারাবেন না।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাজ-মান-ভয়—তিন থাকতে নয়। বড় দুঃখ হয়, আপনারও চোখ ফোটাতে পারলাম না; জ্যোতির সন্ধান আপনিও পান নি।"

আমি বললাম, "পাব বৈ কি? আপনি যখন রয়েছেন।"

তিনি হেসে উত্তর দেন, "হ্যাঁ, আপনার কথা মনে থাকবে; জ্যোতির সন্ধান আপনাকে দেবোই, ভয় নেই। আচ্ছা আসি—। শুধু এ কথাটা প্রচার করবেন।"

আমি উত্তর দেই, "নিশ্চয়ই।"

তিনি ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "দেখুন, এদের জ্বালায় সত্যি পাগল হয়ে যাব না ত?"

আমার উত্তর আমাকেই বিদ্রূপ করে—"না, না, না।"

এক বোতল ব্রাণ্ডি

এ যুগেও এরকমের লোক থাকতে পারে, ভাবতেই পারি নে!

অদ্ভুত ভদ্রলোক, আরো অদ্ভুত তাঁর আলাপ ও আচরণ। বেশ লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ; বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে; অথচ বড় চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠেছেন; একটি তরুণ তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে এসেছে। মনে মনে প্রশ্ন জাগে, ভদ্রলোক কি অসুস্থ?

"নমস্কার পণ্ডিতমশাই, বড় বিপদে পড়ে এসেছি; আমি যে আর কথা বলতে পারছি নে।"

"বসুন ওই চেয়ারটায়; আপনি কি অসুস্থ? এরূপ অবস্থায় এখানে আসাই আপনার অন্যায় হয়েছে।"

ভদ্রলোক যেন অতিকষ্টে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন; আবার বুকে হাত বুলাতে লাগলেন; "আঃ—আঃ,—পণ্ডিতমশাই, আমার যে সর্বনাশ হতে চলল।"

যুবকটি অতি সন্তর্পণে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিলে; কিন্তু যুবকটির চোখে-মুখে কোন উৎকণ্ঠার ভাবই দেখা গেল না। আমি যুবকটিকেও বসতে ইঙ্গিত করলাম। যুবকটিও একপাশে বসল।

"বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? কি হয়েছে আপনার?"

"কোন কিছু না হলে কি আসি পণ্ডিতমশাই ? কাজ আছে বৈ কি ? না হলে কোথায় খিদিরপুর আর কোথায় শ্যামবাজার ?"

"ঠিকুজী কোষ্ঠী এনেছেন কি ?"

"আরে ছ্যাঃ—ছ্যাঃ ঠিকুজী কোষ্ঠীর নিকুচি করেছে ! কিচ্ছু মেলে না মশাই, কিচ্ছু মেলে না। তাইত আমার এত বিপদ।"

"কেন কি হয়েছে ? অসুস্থ শরীর নিয়ে এতদূর এসেছেন।"

"আমি কি অসুস্থ ছিলেম পণ্ডিতমশাই। আর অসুস্থও আমি নই। আমায় অস্থির করে তুলেছে। দুদিন খাওয়া-দাওয়া ঘুমটুম কিচ্ছু নেই। ফাঁসিকাষ্ঠের আসামীর মত ঝুলে রয়েছি। কি যে হবে বলতে পারি নে।"

"ব্যাপারটা আমায় বলুন, কি হয়েছে দেখি।"

"তাইত এসেছি পণ্ডিতমশাই, আমার চব্বিশ বছরের চাকরী খতম হতে চলেছে।"

"কেন ? হঠাৎ এতদিনের চাকরী চলে যাবে ? এ ত বড় দুঃখের কথা।"

"হ্যাঁ, চলে যেতে বসেছে ; ছাপোষা লোক মশাই ; এইত বড় ছেলে, দু'দুবার ম্যাট্রিক ফেল করলে। শনির দশা কিনা। এমন ভাল ছেলে আমার। কত গর্দভ পার হয়ে গেল। কিন্তু এ আর পার হতে পারছে না। এবার আমার পালা।"

"আপনি ত আর এ বয়সে পরীক্ষা দিচ্ছেন না ?"

"পরীক্ষা না দিলেও বিষম পরীক্ষায় পড়ে গেছি পণ্ডিত-মশাই, এবার নিশ্চয়ই চাকরী যাবে।"

"নিশ্চয়ই এমন কিছু গোলমাল করেন নি বা অন্যায় কিছু আপনি করেন নি ?"

"না, না, এমন কিছু করবার সুযোগ কোথায় ? টাকা-পয়সার কাঁরবারেও নেই; শুধু গুদামের বড়বাবুর সাহায্য করতে হয়; স্যাণ্ডার্সন ভেণ্ডিকার্ট কোম্পানীর নাম শুনেছেন ? সেই কোম্পানী—খাস বিলাতী কোম্পানী মশাই। বড় ভাল চাকরী ছিল, কোন ঝক্কি নেই; শুধু রসিদের সঙ্গে মাল মিলিয়ে রাখা। আর কোন কাজ নেই; পঁচিশ টাকায় ঢুকে আজ চব্বিশ বছরে দেড়শোতে পৌঁছেছি।"

সহানুভূতির সুরে বললাম, "আহা-হা, চাকুরী গেলে সত্যই কষ্ট হবে ত ?" ০

তিনি বললেন, "কষ্ট হবে না ? ছাগলের পালের মত একপাল কাচ্চাবাচ্চা মশাই। তিনপো দুধে দেড়সের জল মিশালেও দু ছটাক ক'রে পেটে পড়তে পায় না। ভাগ্যিস্ পৈতৃক ভিটে আর লক্ষ্মীনারায়ণের দেবোত্তরটা ছিল।"

"দেখি আপনার কোষ্ঠী ? কি হয়েছে অপিসে ?"

"দেখুন, দেখুন, চব্বিশ বছর আগেকার সাড়ে সতেরো হাত লম্বা ওই কোষ্ঠীটা।"—তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন।

"সময় টময় ঠিক আছে ত ?"

"আরে মশাই, ঠিক আছে কি না আমি জানব কি করে ? আমার জন্মের সময়টা ত আমি রেকর্ড করে রাখিনি; এইত লেখা আছে দেখুন, নিশার্ধাৎ সাড়ে দ্বিদণ্ড সময়ে জাতঃ। এখন কেউ বলেন অষ্টোত্তরী, কেউ বা বলেন বিংশোত্তরী। ইনি

বলেন, কন্যা লগ্ন; তিনি বলেন, সিংহ লগ্ন! আপনাদের ত এক একজনের এক এক রকম বায়নাক্কা।"

তাঁর কথা শুনে হাসি পায়; কোষ্ঠীর ছক দেখতে লাগলাম; "কই, এখন ত চাকুরী যাবার মত কিছু দেখি না।"

ভদ্রলোক সচকিত হয়ে হাতজোড় করে বলে উঠলেন, "তাই হোক, পণ্ডিতমশাই, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।"

আমি বললাম, "কন্যা লগ্ন, তুলা রাশি আপনার। কিছু অপব্যয় হতে পারে; অযথা ব্যয়, প্রতারণায় ক্ষতি ও বুদ্ধির দোষে গোলযোগ হতে পারে।"

তিনি বললেন, "অল্ রাইট।" (বুকে হাত বুলাতে বুলাতে) বললেন, "ঠিকই বলেছেন, বুদ্ধির দোষে গোলযোগ ঘটতে বসেছে; শুধু বুদ্ধির দোষে পণ্ডিতমশাই : কি হবে আমার—"

ভদ্রলোকের কাঁদো কাঁদো স্বর ও হা-হুতাশ আমাকে বিচলিত করে তুলল; অথচ ভদ্রলোক আসল কথাটা কি বলেন না; তিনি কি অপিসের কোন জিনিস নষ্ট করেছেন? না কোন জিনিস গুদোম থেকে সরিয়ে দিয়েছেন? কিছুই বুঝতে পারি না। তাঁকে বললাম, "আচ্ছা অপিসে কি হয়েছে? ব্যাপারটা আমায় খুলে বলুন।"

এবার তিনি যেন ককিয়ে উঠলেন, "না, না, অপিসে কিছুই হয়নি; সবাই আমাকে ভালবাসে; বছরে পাঁচবার লক্ষ্মী-নারায়ণের ভোগে অপিস সুদ্ধ সবাইকে নেমন্তন্ন করি কি না।"

"তাহলে আপনার চাকুরী যাবে কেন? আপনি যখন কোন দোষ করেন নি?"

"হ্যাঁ দোষ করি নি। তা ঠিক। কিন্তু একটা গোলমাল করে ফেলেছি; বুদ্ধির দোষেই বলতে পারেন। শুক্রবারে বড়-দিন গেছে কি না; ঐদিনই সর্বনাশ করে ফেলেছি।"

"কি সর্বনাশ করে ফেলেছেন? ঐদিন নিশ্চয়ই অপিস ছুটি ছিল; তাহলে কি রাস্তায় ঘাটে অপিসের কাউকে অপমান করে ফেলেছেন?"

"না, না, তেমন ছেলে গৌরশর্মা নয়। সেদিন এমন একটা কাজ করে বসেছি; যার জন্যে এখন অবধি বুকটা ধড়ফড় করছে। বিপদ্‌টা কাটবে ত?"

এতক্ষণে ছেলেটি মুখ খুললে, "বলে ফেল না বাবা, মিছা-মিছি এত সময় নষ্ট করছ কেন?"

তিনি বললেন, "কি করে বলব? কথাটা উচ্চারণ করতেও আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হচ্ছে; ওই বোতলটাই সর্বনাশ করবে; আমার চোখের সামনে যেন একটা বোতল বিদ্রূপ ক'রে নেচে বেড়াচ্ছে। আর পারি নে।"

ভদ্রলোক চোখ বুঁজলেন; আমি বিস্মিত হয়ে উঠি তাঁর কথায়-বার্তায়। ছেলেটিকে প্রশ্ন করি, "তুমিই বল, কি হয়েছে? কিসের বোতল? কাউকে বোতল ছুঁড়ে মেরেছেন না কি?"

যুবকের মুখে মৃদুহাসি ফুটে উঠল; সে বললে, "এমন কিছুই হয় নি; বড়দিনের দিন সকালে সাহেবকে ভেট দিয়ে এসেছেন, অনেক জিনিসপত্তর। তার মাঝে এক বোতল···।"

ভদ্রলোক হঠাৎ তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "চুপ কর খোকা। কথাটা উচ্চারণ করিস নে। ওটার কথা মনে হলেই

আমার গাটা কেমন শিউরে উঠে। অথচ এটা আমার বুঝা উচিত ছিল, এমন পবিত্র দিনে, তাঁদের সেই ত্রাণকর্তার জন্মদিনে এরকম একটা জিনিস কি উপহার দেওয়া যায়।"

"ওঃ, বড়দিনের উপহার দিয়েছেন সাহেবকে। বেশ করেছেন ; তাতে খুশীই হবে নিশ্চয়।"

"খুশী করবার জন্যেই ত দিয়েছি পণ্ডিতমশাই, এই খোকাটার জন্যে বড়বাবুর কত হাতে পায়ে ধরছি। দু'বছর ঝুলিয়ে রেখেছে। সাহেবটা এবছরই চলে যাবে। যাবার আগে যদি একবার চোখ তুলে চায়।"

"বেশ, বেশ, কাজ হবে মনে হচ্ছে ; কিন্তু এতে ভয় পাবার কি আছে ? আপনি ত কোন অপরাধ করেন নি ?, সঙ্গে বুঝি এক বোতল মদও দিয়েছেন ?"

ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বুকে হাত বুলাতে বুলাতে কষ্টের সুরে বললেন, "হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই। বড় সাধ করে অনেক টাকা খরচ করে তা যোগাড় করেছি। কিন্তু এমন একটা পবিত্র দিনে ওটা দেওয়া উচিত হয় নি।"

আমি বললাম, "ওরা মদ ভালবাসে। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে দু'এক বোতল মদ দিলেই ওরা বেশী খুশী হয় ; আর মদটা অপবিত্র জিনিস আপনাকে কে বললে ?"

তিনি বললেন, "কেন শাস্ত্রেই রয়েছে। তারপর খৃষ্টের জন্মদিনের মত একটা পবিত্র দিনে মদের মত একটা জিনিস দেওয়া ?"

সহাস্যে উত্তর দেই, "সেদিন ওঁরা আরো বেশী করে মদ

খায় ; শীতের দেশ,—জানেন না ? সেখানে হয়ত শিশুদেরও ব্রাণ্ডি খেতে দেয় !"

সসংকোচে ভদ্রলোক বললেন, "ঠাট্টা করবেন না, পণ্ডিত-মশাই ; সবাই বলছে, আমার উপায় নেই। এই খোকার গর্ভধারিণী পর্যন্ত বলছে, ছিঃ ছিঃ তুমি এমন কাজ করলে ! ঠাকুর দেবতার জন্মদিনে একটা মদের বোতল দিলে ! সাহেব নিশ্চয়ই রাগ করবে।"

সকৌতুকে বললাম, "না, না, রাগ করবে না ; ওঁদের ঠাকুর দেবতায় তফাৎ আছে ! আপনার স্ত্রী তা জানবেন কি করে ?"

তিনি বললেন, "আরে মশাই, তিনি জানবেন না ? ভট্টাচার্য বামুনের মেয়ে ; বড্ড শুচিবাই ! আচার-বিচার নিয়েই রাতদিন ব্যস্ত ! ঘরে মুড়ি পড়লে, তাতেও গোবরজল দিতে হবে !"

হেসে উত্তর দেই, "তিনি ত আর সাহেবদেব ধর্মের নিয়ম-কানুন জানেন না ?"

ভদ্রলোক বললেন, "তবু ত মদ ; পাড়ায় একাউণ্টস্ ডিপার্ট-মেণ্টের বড়বাবু থাকেন ; তাঁকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম ; তিনি বললেন, সর্বনাশ করেছ ; তোমার গিন্নীর কথাই ঠিক। তার উপর অপিসের কোন কর্মচারী বড়দিনে ভেট দেয়, এটা সাহেবরা চায় না। তুমি আবার মদ দিতে গেলে কেন ?"

আমি বললাম, "আমি বলছি, কিছুই হবে না ; আপনার চাকুরী যেতে পারে না। আর আপনাদের অপিসে যখন এরকম ভেট দেওয়ার রীতি নেই, তখন দিতেই বা গেলেন কেন ? ভাল মদ দিয়েছেন ত ?"

তিনি বললেন, "তা আর বলতে? একেবারে পয়লা নম্বর —একবোতল ব্রাণ্ডি; সাহেববাড়ী থেকে কেনা? ফ্রেস— একেবারে টাটকা মাল। সাহেব খেলে খুশীই হবে।"

আমি বললাম, "ঠিকই করেছেন। ভেটের সঙ্গে মদ না দিলে কি আবার ভেট হয়?"

তিনি বললেন, "আপনি যে বলেই খালাস। এদিকে যে আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হচ্ছে; চোখের সামনে ব্রাণ্ডির বোতলটা যেন বিদ্রূপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সোমবারে অপিসের সিঁড়ি উঠতে গিয়েই হয়ত আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে পালাবে।"

তাঁকে বললাম, "আপনি বড় ভীতু। তাহলে কয়েকদিন ছুটি নিন্‌।"

ভদ্রলোক বললেন, "তাতে হৃদ্‌কম্পটা আরো বেড়ে চলবে; তার চেয়ে একদিনে এস্‌পার কিংবা ওস্‌পার একটা হয়ে যাক্‌, সোমবারেই, আপনি ভরসা দিন।"

ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করে বলি, "না, না, কোন ভয় নেই আপনার। সাহেব খুশীই হবে।"

তিনি বললেন, "কোন প্রতীকার থাকলে বলুন। কোন পূজাটুজা কিংবা ধারণ-টারণ?"

"না, না, এসব কিছুই করতে হবে না। আপনার এখন সময় ভাল; আর আপনি ত কোন অন্যায় করেন নি?"

"তবু কি জানি পণ্ডিতমশাই। লক্ষ্মীনারায়ণকে তিনদিন ধরে তুলসী দিচ্ছি; খোকার চাকুরীর জন্যেই এত ফ্যাসাদ। তা

তিনি এ রকম চাকুরী করবেন না। বলুন ত পণ্ডিতমশাই, এরকম কাজ আর পাবে কোথায় ? শুধু রসিদের সঙ্গে মাল মিলিয়ে লিখে রাখতে হবে। ও কে !—ব্যাস। এই ত শুধু লেখাপড়া ! কোন টাকাপয়সার কিংবা হিসাবপত্রের ঝামেলা নেই ; দশটা পাঁচটায় যাওয়া-আসা আর মাসে দেড়শো করে ঘরে আনা। স্যাণ্ডার্সন ভেণ্ডিকার্ট কোম্পানীর কাজ ! কত বড় নামকরা কোম্পানী ! লাটেরা পর্যন্ত আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে বসে মদ খেতেন।"

এবার হেসে উত্তর দেই, "বুঝলেন ত, মদটা ওঁদের কত আদরের জিনিস ; অতিথির অভ্যর্থনার একটা প্রধান অঙ্গ। আপনারা মদ খান লুকিয়ে, ওঁরা খায় প্রকাশ্য সভায়। কাজ হবে আপনার; ব্রাণ্ডি নিষ্ফল হবে না।"

ভদ্রলোকের মুখে যেন আশার আলো দেখা দিল, "তাহলে আমার কোন ভয় নেই বলছেন ? সাহেব একমাস পরেই চলে যাবে. তার আগে আমার কাজটা করে দিয়ে যাবে ত ? না চাকুরী খত্‌ম করে দিয়ে যাবে ?"

তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলি, "হ্যাঁ, কাজ হবে। দেখুন না মাসখানেকের মধ্যে কি হয়। আমায় জানাবেন কিন্তু।"

ছেলের কাঁধে ভর না দিয়েই এবার ভদ্রলোক উঠতে পারলেন ; যথারীতি নমস্কার করে পিতাপুত্র বিদায় হলেন।

মাসখানেক পরে এক ঝুড়ি ফলমূল ও মিষ্টি নিয়ে এসে ছেলেটি হাসিমুখে আমাকে প্রণাম করলে ; সাহেব যাবার আগে তাঁর চাকুরী করে দিয়ে গেছে। ছেলেটি চলে গেলে ঝুড়ি থেকে ফলমূল নামিয়ে দেখি—একবোতল ব্রাণ্ডিও রয়েছে।

মৃত্যু কর

"অ্যাঁ! কি বলছেন ? আরো বারো বছর ?"

রাজু দত্তের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তাঁর ঋজু বলিষ্ঠ দেহে বার্ধক্য দেখা দিয়েছে। বয়স ষাটের উপর হলেও তাঁর আঁটসাঁট দেহ-সৌষ্ঠব এখনও নষ্ট হয় নি। দু'-একগাছি চুলে পাক ধরলেও পাঁচ-ছয় মাস আগেও এমনভাবে সমস্ত মাথাটা সাদা ধবধবে দেখিনি। আমার কথা শুনে এক নিমিষে যেন বার্ধক্যের লোল ভাব আরো নুইয়ে দিলে তাঁর সোজা মাথাটাকে।

ঝানু এটর্নি রাজু দত্ত। তাঁর অমায়িক মধুর ব্যবহারে কে না মুগ্ধ হয় ? আইন-কানুনের সকল ফাঁকি-ঝুঁকি তাঁর নখ-দর্পণে। তাঁর কলমের কারসাজিতে পঁচিশ বছরের বেহাত সম্পত্তিও ফিরে মক্কেলের হাতে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, রাজু দত্তের খপ্পরেই গিয়ে পড়ে; এটর্নির খরচা আর আইনের মর্যাদা বাঁচাতে গিয়ে দু'বিঘা জমির জন্য দু-লাখ টাকা খরচ করে অনেকে ইচ্ছা করেই ফতুর হয়ে বসে; রাজু দত্ত আর কি করতে পারে ? দত্ত মশাইয়ের লক্ষ্মীকে অচলা না বলে ঊর্ধ্বমুখী বলা চলে।

সেই রাজু দত্ত এমন একটা ভুল করে বসবেন তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। আর তিনি যে আজ এমন অবস্থায় এমন জায়গায় আমার কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে এমনভাবে নুয়ে পড়বেন, তা আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবি নি।

কলকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গার ধারে ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ী। সামনে অবশ্য কিছু খালি জমি আছে; ফুলের বাগান বলা চলে। জবা করবী আর বেলফুলের কয়েকটি গাছে ফুল ফুটেছে। বর্ষাকাল,—ঝির ঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছে; বারান্দায় বসে আমি আর রাজু দত্ত। পাশেই গঙ্গা; তার বুকে বাদলা হাওয়ায় অশান্ত তরঙ্গের উচ্ছলতা দেখা যাচ্ছে, একটা পাল-তোলা নৌকার পালের দড়িটা ছিঁড়ে গেল বলে মনে হ'ল। দেখি পালটা হঠাৎ আকাশের দিকে পত্‌পত্‌ করে উড়ে যাচ্ছে মাঝি-মাল্লারা হৈ হৈ কলরব করছে।

ভাবছি, বড়লোকের সখ বা খেয়ালের কথা। কোথায় বালিগঞ্জের প্রকাণ্ড প্রাসাদ আর কোথায় গঙ্গার ধারে এই অতি সাধারণ একতলা বাড়ী। মনে মনে হেসেছিলাম; কিন্তু রাজু দত্তের কথা শুনে স্তম্ভিত হলাম; মানুষ এমন করেই ভুল করে।

রাজু দত্তের কোষ্ঠীর বিচার,—আয়ু দেখতে হবে। অন্তত আর ক'বছর টিকে থাকতে পারেন তার একটা আভাস দিতে হবে। অনেকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে বললাম, আরো অন্তত বারো বছর; শনির দশায় আপনার মৃত্যু হতে পারে না।

"আাঃ, বলেন কি? তা'হলে তারা আমায় প্রতারণা করেছে?"

"কিসের প্রতারণা? কে কি করেছে?"

"ওরা জোট বেঁধে আমায় প্রতারণা করেছে, ঠকিয়েছে পণ্ডিত মশাই!"

"কারা? আর আপনার কোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?"

"নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে। ছোট বেলায় এক জ্যোতিষী

আমার কোষ্ঠী দেখে বলেছিল, এ ছেলে অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হবে। আর মান-মর্যাদা পাবে প্রচুর। তাই জ্যোতিষে আমার অটল বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। তারই সুযোগ তারা নিয়েছে। কুকুর সব,—আমারই পোষা কুকুর।"

রাজু দত্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারি নে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে দত্তমশাই।"

নিজের কপালে চাপড় মেরে তিনি উত্তর দিলেন, "হবে আর কি? আমাকে পথে বসিয়েছে।"

তাঁর কথা হেঁয়ালির মত ঠেকল। যাঁর বাড়ী গাড়ীর অভাব নেই, ব্যাঙ্কেও শুনি বিস্তর টাকা, ছেলেপিলেও নেই, শুধু তিনি আর তাঁর গিন্নী। বাড়ীতে একপাল চাকর আর ঝি। আর থাকে এক নাতি। তাঁর ভাই-ঝির ছেলে। তাঁর বাবা দত্ত-মশায়ের মত বড়লোক না হলেও বাড়ীগাড়ী আছে। বড় চাকুরীও করেন।

নিতান্ত ভালবাসেন বলেই নাতিটিকে কাছে রেখেছেন তিনি। ঝানু এটর্নি রাজু দত্তের হাতেই তাঁর হাতেখড়ি হয়েছে। নাতি বিনু মিত্রও এটর্নি। সুদর্শন যুবক। বয়স এখনও ত্রিশ পার হয় নি। দিদিমা আর দাদামশাইয়ের অসহায় অবস্থার একমাত্র কর্ণধার হয়ে বসেছে সে কয়েক বছর থেকে। পিতৃমাতৃহীনা ভাইঝি-র একমাত্র ছেলে শেষকালে কি কোন জাল-জুচ্চুরিতে ধরা পড়েছে? নিশ্চয়ই কোন মক্কেলের দলিলপত্র কিম্বা টাকাকড়ি হেরফের করে কোন বিপদ ঘটেছে।

রাজু দত্তকে বললাম, "সবই বুঝলাম, কিন্তু আপনার আয়ুবিচারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি ?"

তিনি বললেন, "তাও বুঝলেন না পণ্ডিতমশাই, আমায় তারা ভাঁওতা দিয়েছে। বলেছিল, বড়জোর দু'চার বছর আয়ু আছে; এক্ষুণি যা হয় একটা কিছু করে নিন্। কি জঘন্য ষড়যন্ত্র।"

আমি বললাম, "ও আপনাকে বুঝি বলেছিল, আপনি আর বড় জোর দু'চার বছর বাঁচতে পারেন।"

উত্তেজিত রাজু দত্ত উত্তর দিলেন,—"হ্যাঁ, দু'চার বছর বলেছিল, কিন্তু ছয়-সাত বছর কেটে গেছে। আরো কত দিন কাটবে কে জানে।"

"তা ভুল করতে পারে। আয়ুগণনা বড় জটিল কি না ? আর তাতে হয়েছে কি।"

"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

রাজু দত্তের উত্তেজনার কোন কারণই আমি বুঝতে পারিনে। না হয়, কেউ পঁচাশির জায়গায় পঁয়ষট্টি বলেছে। তাতে বৃদ্ধের কি যায় আসে ? বরং আগে-ভাগে বলে ভালই করেছে। মরণের ভয় যদি ওঁর কূট জাল গুটিয়ে আনে, তা'হলে বহু লোকের উপকার হয়। তাঁকে বললাম, "আপনার মত লোকের তাতে ভয় পাবার কি আছে দত্তমশাই ? বুঝতেই পারছেন যারা বলেছে তারা ভুলই করেছে।"

"না, না, ভুল নয়,—রীতিমত ষড়যন্ত্র করেছে।"

"কিসের ষড়যন্ত্র ? আপনাকে ভয় দেখিয়ে নিজেদের মতলব সিদ্ধ করে নিয়েছে বুঝি ?"

"কতকটা তাই। নিজের হাতে গড়ে তুলেছি কিনা। নিজের চাবিকাঠি আমি যে তাদের হাতে তুলে দিয়েছি।"

"চাবিকাঠি ?"

"হ্যাঁ চাবিকাঠি। আমার বুদ্ধির চাবিকাঠি ; যাতে করে— আমার কেন সবারই সিন্দুকের তালা খোলা যায়।"

রাজু দত্তের কথা বুঝতে পারি নে। মনে হল, বৈষয়িক কোন বিভ্রাটে কিংবা মামলা-মোকদ্দমায় তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। হয়ত অতি-বিশ্বাসী কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

প্রকাশ্যে বললাম, "সময়টা অবশ্য ভাল নয়। বৃষলগ্ন-বৃষরাশির সপ্তমে শনি এখন খারাপই বুঝায়। শরীর ও মনের উপর চাপ পড়বে।"

অধীর হয়ে তিনি উত্তর দিলেন, "শনি আমার কি করবে পণ্ডিতমশাই। আমি তা গ্রাহ্যই করি নে। আসলে আমার রক্ষা কবচই হারিয়ে ফেলেছি।"

আমি বললাম, "ওঃ ! আপনি কোন কবচ ধারণ করেছিলেন বুঝি। তা হারিয়ে গেছে ?"

তাঁর মুখে ভ্রূকুটি আর বিকট হাসি,—"হোঃ—হোঃ—হোঃ, সত্যই আমার রক্ষাকবচ হারিয়ে ফেলেছি পণ্ডিত মশাই। সে কবচ হারালে আর ফিরে পাওয়া যায় না।"

তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্য বললাম, "যখন হারিয়েই ফেলেছেন, তার জন্য আপসোস করে লাভ কি ? আবার না হয় একটা—"

আমার কথায় বাধা পড়ল ; আবার সেই বিকট হাসি,—"হোঃ—হোঃ—হোঃ, আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি পণ্ডিত মশাই, আমি কি হারিয়েছি।"

সান্ত্বনার সুরে বললাম, "পুরনো জিনিসের উপর একটা মায়া জন্মে যায়, এটা ঠিক। কিন্তু যখন হারিয়েই গেছে, তার আর উপায় কি ?"

রাজুদত্ত বললেন, "পণ্ডিতমশাই, একটা জীবন দিয়েও সে কবচ আর তৈরী হয় না। সে কবচ আমার নিজের উপর বিশ্বাস আর আমার বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয় ; চল্লিশ বছরের সাধনায় লোহা থেকে তা সোনায় পরিণত হয়েছিল ; তা কি আর পাওয়া যায় ?"

বৃদ্ধ রাজুদত্তের কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গী আমাকে বিস্মিত ও ভয়চকিত করে তুলল। তিনি কি পাগল হয়ে পড়েছেন ? শুনেছি, কিছুদিন হয় কাজকর্মের ভার বিষ্ণুমিত্রের উপর ছেড়ে দিয়েছেন ; নিজে কিছুই দেখেন না। ভাবলাম, হয়ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এমন অকেজো জীবন কাটাতে অনভ্যস্ত রাজুদত্ত অস্থির হয়ে উঠেছেন। এ কি বিড়ম্বনা ?

তাকে বললাম, "আপনি কাজের মানুষ চিরকাল কাজই করে চলেছেন। এখন কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়ায় অস্বস্তি বোধ করছেন, তা ছাড়া আর কিছুই নয় !"

তিনি বললেন, "ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু আর যে কোন উপায় নেই।"

আমি বললাম, "কেন ? আমরাত শুনেছিলাম নাতিকে

কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে আপনি দেশ-বিদেশে ঘুরে আসবেন কিছু দিন। তার কি হল ?"

তিনি আবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, "মিথ্যে কথা। কে রটিয়েছে এসব ? বাইরে যাবার সখ আমার কোন দিনই ছিল না ; আর এখনও নেই। তবু ভাবছি, গেলেই ভাল হ'ত ; ওই সব কুকুরদের পাল্লায় পড়ে এখন তারও উপায় নেই।"

আমি বললাম, "দেখুন, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। আয়ুর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার উত্তর দিয়েছি ; এখন সময়টা খারাপ তাও বলেছি।"

রাজুদত্তের মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল ; তিনি বললেন, "ডেথ-ডিউটি জানেন ? ডেথ-ডিউটি ? যাকে বলে মৃত্যুকর—মৃত্যুর পর গভর্ণমেণ্ট একটা ট্যাক্স আদায় করে।"

"হ্যাঁ শুনেছি বটে, লাখ টাকার ওপর সম্পত্তির দাম হলে মৃতের যারা উত্তরাধিকারী তাদের কাছ থেকে গভর্ণমেণ্ট আদায় করে নেয়।"

"জানেন আমার সম্পত্তির ভ্যালুয়েশন কত হবে ?"

"না আমার কোন ধারণাই নেই। হয়ত কয়েক লাখ হবে।"

গর্বের হাসি রাজুদত্তের মুখে ফুটে উঠল,—"কয়েক লাখ ? বলুন দেখি,—কত লাখ ? চারখানা বাড়ী, তিনখানা গাড়ী, ব্যাঙ্কের টাকা—আরো কত কি ? সে আপনি কল্পনাও করতে পারেন না।"

আমি সংকোচের সঙ্গে বললাম, "এ আমি কি করে জানব বলুন ?"

তিনি বললেন, "আচ্ছা ওই বালিগঞ্জের বাড়ীটার দাম কত হবে বলতে পারেন ?—সাত লাখ টাকা। বুঝলেন ? তা হলে বুঝুন, আমার সম্পত্তির ভ্যালুয়েশন কত টাকা হতে পারে ?"

রাজুদত্তের কথায় নিজের দৈন্য যেন আমাকে উপহাস করতে লাগল, তাঁর কথার উত্তর দিলাম, "নিশ্চয়ই অনেক লাখ হবে। আপনি যা রোজগার করেছেন, কেউ তা কল্পনাও করতে পারে না।"

রাজুদত্ত বললেন, "জানেন আমার কেউ নেই ; আমরা নিঃসন্তান, সংসারে আমি আর আমার স্ত্রী। তিনি থেকেও নেই। বিছানায় আজ দু'বছর পড়ে আছেন ; এখনও সংকট অবস্থা, কখন কি ঘটে, তার ঠিক নেই।"

আমি বললাম, "তাও শুনেছি। কিন্তু বিনয়বাবুরা রয়েছেন ; আপনার এত ভাবনা কিসের ?"

রাজুদত্ত হাসলেন, "বিনুর কথা বলছেন ত ? তার সময় কোথা ? হ্যাঁ আপনাদের ওই বিনু মিত্র আর তার মা,—তারা বুদ্ধিতে আমাকেও হারিয়ে দিয়েছে, শয়তান সব !"

আমি বললাম, "সে কি রকম ?"

রাজুদত্ত বললেন, "আমার জ্যোতিষে বিশ্বাস বুদ্ধি গুলিয়ে দিয়েছিল ? ডেথ ডিউটির ভূত মরবার আগেই আমার ঘাড় মটকে দিয়েছে।"

আমি বললাম, "ডেথ ডিউটি ত শুনেছি মৃত্যুর পর দিতে হয়।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, মৃত্যুর পর দিতে হয়। আমাদের কেউ

নেই ; আমার যা কিছু আছে, সবই যদি গভর্ণমেন্ট নিয়ে নেয়, তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নেই ; এখন তা বুঝেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে পরে যা হবার হবে ; এখন থেকে তার জন্য দুশ্চিন্তা করে আর লাভ কি ?

রাজুদত্ত আক্ষেপের সুরে বললেন, "জানেন পণ্ডিতমশাই, আমার বালিগঞ্জের বাড়ীতে ঢুকবার অধিকারও আর নেই।"

তাঁর কথায় স্তম্ভিত হলাম ; বৃদ্ধের কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল ? বলে কি ?

রাজুদত্ত আবার বললেন, বিনুদের আমি সব লিখে দিয়েছি। এখন আমার যা সম্পত্তি আছে, তার ভ্যালুয়েশন এক লাখও হবে না। ষ্টেটকে ফাঁকি দিয়েছি ; এই বাড়ী, ছোট্ট একখানা গাড়ী আর ব্যাঙ্কে আছে হাজার কুড়ি টাকা ! আর কিছুই নেই।"

রাজুদত্ত হাসতে লাগলেন, আমি হতবাক ; তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, "বিনু অবশ্য আসে, দিদিমাকে দেখে যায়। ডাক্তার বৈদ্যিও দেখায় ; কিন্তু কদিন হয়, আমি মানা করে দিয়েছি।"

আমি বললাম, "সবই তাঁদের লেখাপড়া করে দিয়েছেন বুঝি ?

তিনি বললেন, "হ্যাঁ বিনুকে বড় বিশ্বাস করি কিনা ? আমায় বললে, দাদু, নতুন আইন হয়েছে ; ডেথ ডিউটি দিতে ফতুর হয়ে যাবো। রাম জ্যোতিষী সেবার অসুখের সময় বলেছিল বড় জোর আর তিন-চার বছর ; এখনই হস্তান্তর করে দাও ; শেষে তাও টিঁকবে না। তোমার জিনিস তোমারই থাকল ;

অথচ মিছামিছি এত টাকা নষ্ট হবে না।—বিন্নুর কথায় বিশ্বাস করেছিলাম আমার মুসাবিদা জানেন ত কোন ফাঁকই থাকে না ; ষ্টেটকে ফাঁকি দিয়ে সেদিন প্রাণ খুলে হেসেছিলাম।"

আমি বললাম, ভালই করেছেন, আপনার জিনিস আপনারই রয়ে গেছে।

না, না, না, না, বিন্নু মিত্র গুরুমারা বিদ্যা শিখেছে! বড় আদরের নাতি কি না? ষ্টেটকে ফাঁকি দিতে গিয়ে আমি নিজেকে ফাঁকি দিয়ে বসেছি—হাঃ হাঃ হাঃ।

বৃদ্ধের বিকট হাসি এখনও আমার কানে বাজে ; রাজুদত্ত পাগল হয়ে গেছেন!

কামধেনু

গাঁয়ে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে।

সকলের মুখেই এক কথা,—"ভগবতীর আবির্ভাব হয়েছে; এইত দেখে এলাম। আহা! চোখ জুড়ায়; জ্যোতি বের হচ্ছে গা দিয়ে!"

সচরাচর এরূপ ব্যাপার ঘটে না। পচাই হাড়ির গাইটা সন্তানবতী না হয়েই দুগ্ধবতী হয়েছে। ঘটনাটা এ অঞ্চলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। দলে দলে লোক তাকে দেখতে যাচ্ছে। পচাইয়ের উঠানের একপাশে একটা বড় পেয়ারা গাছ। গাইটি সেই পেয়ারা গাছে বাঁধা। সুন্দর হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ তার; গায়ে যেন কে তেল ঢেলে দিয়েছে এমনি দেহের কান্তি। গায়ের রঙে সোনালী আভা। পচাইয়ের স্ত্রী মাধু তার নাম রেখেছে হেমা।

অবশ্য হেমা নামটি হেমবর্ণ থেকে ব্যুৎপন্ন হয় নি। এই হেমা নামের একটা ইতিহাস আছে; ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে তার কোন সূত্র বের করা কঠিন। মাধুর কোন ছেলেমেয়ে নেই। বছর কয়েক আগে হেমার মা তিন দিনের বাছুরটিকে রেখে মারা গিয়েছিল। মাধুই তাকে এত বড়টি করেছে। এই বাছুরটিকে কেন্দ্র করেই মাধুর মাতৃত্ব সার্থকতা লাভ করেছে। মাধু যে কি কষ্টে আর কি যত্নে হেমাকে বাঁচিয়েছে, তা মাধুই জানে; পাড়ার লোকেও কিছু কিছু দেখেছে। আমরা রসিকতা

করে বলতাম, "ঐ যে মাধুর মেয়ে হেমা; এবার তার বর আসবে।"

কচি বাছুরটিকে জড়িয়ে ধরে মাধু দাওয়ায় বসে কত রাত কাটিয়েছে তার ঠিক নেই। কচি ঘাস তাব মুখে তুলে দিয়েছে; ঝিনুক দিয়ে ভাতের ফেন গিলিয়েছে; তবে ত হেমা আজ এত বড় হয়েছে।

মাতৃহারা গোবৎসটি যখন হাম্বা হাম্বা করে ডাকত, মাধু তার অনুকরণ করে প্রায় গোসুলভ কণ্ঠে উত্তর দিত,—হাম্-মা, হাম্-মা, হাম্-মা,—হে মা, যাই মা।—ক্রমে ক্রমে বাছুরটির নাম দাঁড়াল হেমা। মাধু ডাকে হেমা। হেমা তার কণ্ঠস্বর শুনলেই ছুটে আসে—"হাম্বা হাম্বা" রব তার কণ্ঠে।

মাধু হেমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়; আব হেমা তার হাত চেটে আদর জানায়। পচাই ও মাধুর বড় আশা তাদের হেমার একটি বাছুর হবে; কিন্তু পাঁচ-ছয় বছর কেটে গেল; হেমা সন্তানবতী হল না। অকস্মাৎ একদিন বুঝা গেল হেমা দুগ্ধবতী হয়েছে। ক্রমে কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য ব্যাপার! দলে দলে ছেলে বুড়ো এ গাঁয়ের ও গাঁয়ের লোক কৌতূহল মিটাতে পচাইয়ের বাড়ী আসে। পেয়ারা গাছে হেমা বাঁধা রয়েছে। তার কপালে কে সিঁদুরের লম্বা তিলক কেটে দিয়েছে। শিং দুটোও সিঁদুরে রাঙানো। পায়ের কাছে স্তূপাকারে ফুল বেলপাতা জমা হয়েছে। দর্শকদের কেহ কেহ তার পায়ে ফুল বেলপাতার অঞ্জলি দিয়েছে। বন্ধ্যা গাভী দুগ্ধবতী

হলে হিন্দুশাস্ত্রে কামধেনু সুরভি আখ্যা পায়। কামধেনু সাক্ষাৎ ভগবতী দুর্গা।

গাই-গোরুর গোবর ও মূত্র পবিত্র জিনিস। তার উপর আবার কামধেনুর গোবর। এক ফোঁটা গোবর কিংবা মূত্র পড়ে থাকবার জো নেই। একটুখানি গোবরের জন্য কাড়াকাড়ি লেগে যায়। কদিন হ'ল, পূজারী গোবিন্দ চক্রবর্তী এসে কামধেনু নিজের হাতে দোহন করে। শাস্ত্রে আছে, কামধেনু অব্রাহ্মণে দোহন করতে নেই ; দুধ লাগে নারায়ণের ভোগে।

জমিদার রামলোচনবাবু কথাটা শুনলেন ; কুলগুরুর উপদেশ চাওয়া হ'ল। গুরুদেব তর্কচূড়ামণি বললেন, "বুঝেছ লোচন, কামধেনু সাক্ষাৎ ভগবতী। এই অজাত-বিজাতের ঘরে ত তাঁকে ফেলে রাখা যায় না। শাস্ত্রে বলে,—

গোমাতা জগতি লক্ষ্মী কামধেনু ভগবতী।
পূজয়েদ্ যো প্রযত্নঃ,নিত্যং শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥

রামলোচন গম্ভীর প্রকৃতির লোক ; গুরুবাক্য শুনে তিনি বললেন, "কি করতে হবে ? তার ব্যবস্থা আপনিই করুন।"

তর্কচূড়ামণি বললেন, "বেটা হাড়ির বাড়ী থেকে আগে মাকে উদ্ধার কর ; তারপর পূজা অর্চনা ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে। বেটা অস্পৃশ্য হাড়ি ; তার বাড়ীতে থাকবেন তিনি ? ঐ পাপে গাঁসুদ্ধ লোকের হবে নরকবাস !"

তর্কচূড়ামণির কথায় জমিদার শিউরে উঠেন। গো-ব্রাহ্মণে কিংবা দেব-দ্বিজে তাঁর অচলা ভক্তি। অন্ততঃ বাইরে থেকে আমরা তা দেখতে পাই। তিনি তখনই পাইক উপেনকে ডেকে

পাঠালেন। উপেন এলে জমিদার হুকুম করলেন, "এক্ষুনি গাইশুদ্ধ পচাইকে হাজির কর।"

এদিকে তর্কচূড়ামণির ব্যবস্থামত কামধেনুর পূজার আয়োজন হতে লাগল। ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজে মিটল না। পচাই গাইটাকে ছেড়ে দিতে কতকটা রাজি হলেও মাধু কিছুতেই হেমাকে ছেড়ে দিতে চায় না। অগত্যা পাইক শুধু পচাইকে জমিদারের সামনে হাজির করল। জমিদার তাকে মূল্য দিতে চাইলেন; পচাই মূল্য নিতে চায় না। চূড়ামণি বললেন, "দেখ বেটা, এ তোর মহাভাগ্যি যে মা তোর ঘরে আবির্ভূতা হয়েছেন। তাই বলে তোর ত একটা কর্তব্য আছে; তুই কি মাকে এরকম ক'রে বেঁধে রেখে তার অমর্যাদা করবি? তোর পাপে কি গাঁসুদ্ধ লোক নিরয়গামী হবে?"

পচাই বলে, "সবই বুঝি কর্তা। মোদের কি সাধ যে মাকে অপমান করি। তবে কি না বউ এত বড়টি করেছে; তাই তার বড় টান। ছেলেমেয়ে নেই কিনা।"

চূড়ামণি বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝি সব। এসব টাকারই টান। ঘোরকলি কি না। সেই বশিষ্ঠ মুনির গল্প জানিস ত? সেই বশিষ্ঠের কামধেনুকে নিয়ে বিশ্বামিত্রের কি লাঞ্ছনা।"

পচাই অবশ্য বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের গল্প জানে না। তাই কোন উত্তর করে না। জমিদার রামলোচন সম্ভবতঃ কামধেনু কেড়ে নিতে গিয়ে বিশ্বামিত্রের যে লাঞ্ছনা হয়েছিল তা স্মরণ করে পচাইকে বললেন, "তা বাপু তোকে গোটাকুড়ি টাকা দিচ্ছি; তুই গরীব মানুষ। এ গাইয়ের বাছুর হবে না; একে পুষে

তোর কি লাভ বল ? তুই বরং ভাল দেখে একটা গাই-বাছুর কিনে নে।”

পচাইয়ের মন তোলপাড় করে উঠে ; তর্কচূড়ামণির উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্যের আলোড়নে তাকে নিরুত্তরই থাকতে হয়।

জমিদার বললেন, “আজই গাইটা দিয়ে যা। বউকে বুঝিয়ে বল ; তা না হলে তোদেরই পাপের বোঝা বাড়বে।”

ঘরে ফিরে এসে পচাই মাধুকে বুঝায়। কিন্তু মাধু হেমাকে ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজি হল না। হেমাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। পচাই বলে, “শোন্ মাধু, হেমাকে রাখায় বিপদ আছে ; আমরা ছোট ; ঠাকুর দেবতাকে আমাদের ছুঁতে নেই।”

মাধু বললে, “রেখে দাও তোমার ঠাকুর দেবতা। আমরা ত তাঁকে ডেকে আনি নি। মোদের ছুঁলে যদি তাঁর জাত যায়, তাহলে মোদের ঠাঁই তিনি এলেন কেন ? দেবতাদের আবার জাত আছে নাকি ?”

পচাই কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। তারও মনে সংশয় জাগে, দেবতাদের আবার জাত আছে না কি ? মন্দিরে মন্দিরে ছোঁয়াচ বাঁচাবার এত ঘটা কেন ?—জমিদার বাড়ীর দুর্গোৎসবে দূর থেকে প্রতিমা দেখে তার তৃপ্তি হয় না। বিসর্জনের দিন সে প্রতিমা ছুঁতে পায় ! এই হাড়ি আর বাউড়িরাই কাঁধে করে প্রতিমা নিয়ে যায়। তখন ত দেবতাদের পবিত্রতা নষ্ট হয় না ! তাই বিসর্জনের দিনটা তার সবচেয়ে ভাল লাগে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলে উঠে, “হ্যাঁ, দেবতার আবার জাত কি ?”

গোবিন্দ চক্রবর্তী কামধেনু-দোহনে ব্যস্ত ছিলেন ; কথাটা তার কানে গেল ; তিনি বললেন, "আরে মাধু, কথাটা বুঝলি না ? ছোটলোকের ছেলে কি আর জজ-ম্যাজিষ্টর হয় না ? আজকাল ত লেখাপড়া শিখে আকছারই হচ্ছে। মনে কর, তোর হেমা সে রকম একটা কিছু হয়েছে। তাকে ত জজ-ম্যাজিষ্টরের মত থাকতে হবে।"—হিঃ-হিঃ করে চক্রবর্তী হাসতে থাকেন।

গোবিন্দ চক্রবর্তীর কথাটা মাধুর বেশ মনে লাগল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অগত্যা রাজি হ'ল ; তার হেমা সুখে থাকবে ; জজ-ম্যাজিষ্টরের মত হবে ; হোক্ না নিজের কষ্ট। তবু ত দিনে দশবার দেখতে পাবে।

জমিদার বাড়ীতে মহা ধূমধাম। ঠাকুরঘরের পাশে যে একচালাটি আছে তার মেঝেটা নূতন কাঠের পাটাতনে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। উপরে বিচিত্র চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। ঘরের ভেতর কামধেনু—হেমা। ঘরের চারপাশে শক্ত বাঁশের গড় ; যেন হেমা বের না হতে পারে। আজ কামধেনুর প্রতিষ্ঠা উৎসব। তর্কচূড়ামণি নিজে পূজার ভার নিয়েছেন। ষোড়শ উপচারে আয়োজন। তার সঙ্গে শ্যামল দূর্বাদলের একটা বৃহৎ নৈবেদ্য। শঙ্খ ঘণ্টা ও কাঁসরের আওয়াজে কামধেনু অস্থির। ধুপধুনার অনভ্যস্ত ধোঁয়ায় সে ত্রাহি ত্রাহি হাম্বা রব তুলছে। তর্কচূড়ামণি সভয়ে মন্ত্রপাঠ করছেন। দূরে দাঁড়িয়ে মাধু তা দেখছে ; তার মন অব্যক্ত আনন্দে ভরে উঠে ; তার হেমা দেবতা !

ব্যাপার কিন্তু অন্যরূপ দাঁড়াল। ষোড়শ উপচারে পুজা পেয়েও গোমাতা আজ দু'দিন উপোস রয়েছে; হেমা একটা কুটো পর্যন্ত মুখে তোলেনি। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ অতি চিক্কণ চালের সুস্বাদু অন্ন তৈরী করে তার মুখের সামনে ধরলেন; তবুও দেবীর মুখে তা রোচে নি। এদিকে মাধুও দু'দিন জলস্পর্শ করে নি; পচাইও ছট ফট করছে। তর্কচূড়ামণি মন্তব্য করেন, "এদ্দিন অজাতের ঘরে ছিল কি না, কুকুরের মুখে কি ঘি ভাত রোচে ?"—আবার দাঁতে জিভও কাটেন অপরাধ হয়েছে !

পচাই জমিদারের পায়ে এসে পড়লে, "হুজুর! আমার হেমাকে ফিরিয়ে দিন। না হলে ও মারা পড়বে।"

জমিদার উত্তর দেন, "আমি ত আর শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করতে পারি নে পচাই! তুই মন খারাপ করিস নে। মা আমার উপবাসী রয়েছেন; আমাদেরও কি কম কষ্ট হচ্ছে! সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখ না দু'দিন।"

তর্কচূড়ামণি বলেন, "বেটা অজাত, মায়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে! আর কি তোকে ছুঁতে দেওয়া যায় ?"

এর উপর আর কোন কথা চলে না। হেমার হাম্বা হাম্বা রব সে শুনতে পায়। তার ব্যাকুল আর্তনাদ পচাইকে আকুল করে তোলে। সে দ্রুতপদে বের হয়ে যায়; তখন সন্ধ্যা।

হেমা জমিদার বাড়ী থেকে পালিয়েছে; গোরূপী ভগবতীর রাজকীয় আড়ম্বর সহ্য হয় নি। হাড়ির ঘরে যার জন্ম, তার কি এসব আরাম পোষায়? শেষ রাত্রে জমিদার বাড়ীতে

হুলস্থূল কাণ্ড। জমিদারগিন্নী মুক্তপ্রভা শেষরাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠেছেন; তার একমাত্র পুত্র শৈবাল যেন গোমাতার শিঙের গুঁতায় ধরাশায়ী হয়েছে; অমনি হৈ-চৈ পড়ে গেল। এ কি? কামধেনু কোথায়?

ভোর হ'ল; হেমা পচাইয়ের উঠোনে সেই পরিচিত পেয়ারা গাছের তলায় শুয়ে আছে। মাধু সযত্নে তার মুখে ঘাস তুলে দিচ্ছে; আর গলা জড়িয়ে চোখের জল ফেলছে। পচাই দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে। এমন সময় জমিদারের পাইক আর লোকজন এসে উপস্থিত হ'ল। পাইক এগিয়ে এসে বললে, "চল পচাই, এক্ষুনি গাইটা নিয়ে।"

পচাই বললে, "সে আমি পারব না বাপু, তোমরা পার নিয়ে যাও।"

জমিদারের লোকজন হেমাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগল; কিন্তু তাকে একচুলও নড়ানো গেল না। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হেমা শুধু হাম্বা হাম্বা করে আর মাধুর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। পচাই একগাছা লাঠি হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়াল, সে চীৎকার করে বলে উঠল, "বেরিয়ে যাও এখান থেকে; খবরদার বলছি। আমার গাই আমি দেবো না।"

পচাইহাড়ির রুদ্রমূর্তি দেখে জমিদারের পাইক উত্তেজিত হয়ে বললে, "কি, এত বড় আস্পর্ধা! শালাকে সুদ্ধ বেঁধে নিয়ে যাব।" পচাই তখন লাঠি ঠুকে দাঁড়াল,—"দেখি কোন্

বেটা আমার সামনে আসে আসুক; বেরিয়ে যাও,—বেরিয়ে যাও বলছি।”

জমিদারের পাইকও মাটিতে লাঠি ঠুকে বললে, “দেখ পচাই, ঝামেলা করিস নে। এখনও বলছি, গাই নিয়ে চল; না হলে ভাল হবে না।”

পচাই উত্তেজিত ভাবে উত্তর দেয়, “না, না, না, তোমাদের যা খুশী হয় কর।”

পাইকের ইঙ্গিতে জমিদারের লোক গাইটির দড়ি ধরে টানতে লাগল; তার কণ্ঠে আর্তস্বর “হাম্বা—হাম্বা।” মাধু হেমার গলা জড়িয়ে ধরে আছে; সে বলছে,—না, না, আমার হেমাকে যেতে দেব না।

উঠোনে টানাটানি ও ধ্বস্তাধ্বস্তি চলতে লাগল; জমিদারের পাইক বলে উঠল, “হেই মাগী সরে যা।”

অমনি পচাই পাইকের হাতে লাঠির বাড়ি মারলে; লাঠি ঘুরিয়ে পচাই চীৎকার করে বলতে লাগল, “দূর হ, দূর হ, ব্যাটারা!”

ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে জমিদারের লোকজন পালিয়ে গেল; মজা দেখতে ইতিমধ্যে বিস্তর লোক জড় হয়েছিল। গোবিন্দ চক্রবর্তী বললেন, “এ তুই ভাল করলি নে পচাই। তোর ভিটে মাটি দেখছি উচ্ছন্নে যাবে।”

“রেখে দাও ঠাকুর ওসব কথা; গাই ত আমি দিয়েছিলেম; ব্যাটারা উৎপাত করলে; যা মুখে আসে তাই বললে। আমার কি দোষ বল!” আক্ষেপের সুর ফুটে উঠে পচাইয়ের কণ্ঠে।

কয়েক ঘণ্টা পর আবার জমিদারের লোকেরা এল ; কিন্তু সঙ্গে এল কয়েকজন লালপাগড়ি পুলিস। পচাই গোরু চুরি করেছে। তার উপর চোরাই মাল উদ্ধার করতে এসে জমিদারের লোকজন তার হাতে মারধোর খেয়েছে। পুলিস হুকুম করলে, "গাইটা নিয়ে চল।"

পচাই বললে, "আমি যাব না ; পার গাইটাকে নিয়ে যাও।"

পুলিস তাকে প্রথমে মিষ্টি কথা বললে, "চলে আয় ব্যাটা, দারোগাবাবু তোকে মাপ করবেন। জমিদারবাবুও ভাল মানুষ। মিছামিছি ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঝামেলা করিস নে।"

পচাই কিছুতেই রাজি হল না। কাজেই তার হাতে দড়ি পড়ল ; দুজন পুলিস পচাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। আর কয়েকজন গাইটাকে বেঁধে টানাটানি করতে লাগল।

গাইটার বুক-ফাটা চীৎকার 'হাম্বা' হাম্বা, মাধুকে পাগল করে তুললে। মাধু চীৎকার করে উত্তর দেয়, হেমা—হেমা!

কিছু দূর যাবার পর হঠাৎ হেমা দড়ি ছিঁড়ে ফেললে। ক্ষিপ্ত গোরু শিঙ উঁচিয়ে লোককে তাড়া করতে লাগল। এদিকে 'হেমা হেমা' আর্তনাদে মাধু উঠোনে গড়াগড়ি দিচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তর্কচূড়ামণি মজা দেখছিলেন ; চূড়ামণিকে দেখতে পেয়ে হেমা যেন আরও ক্ষেপে গেল। শিঙ উঁচিয়ে তাঁকে তাড়া করল গাইটা ; মুক্তকচ্ছ চূড়ামণির খড়ম আর নামাবলী কোথায় উড়ে গেল ; পাশে থেকে গোবিন্দ চক্রবর্তী বলে উঠে, "খুড়োমশাই, কাপড়টা সামলান।"

তর্কচূড়ামণি একহাতে কাপড় টানতে টানতে বলেন,

বাবা, গাইটা সামলাও! প্রাণে যে মরি! কাপড় বাঁচাব না প্রাণ বাঁচাব?

মাধু আমাকে দেখতে পেয়ে বললে, "দাদাঠাকুর, কি হবে? কি হবে আমার হেমার আর বুড়োর?"

জ্যোতিষী আমি। আমার কথা তার কাছে বেদবাক্য। তাকে বলি, "ওঠ মাধু! দেখবি কিচ্ছু হবে না।"

কয়েকদিন পর দেখি, পচাই বাড়ী ফিরেছে। অবশ্য কয়েক-দিন তাকে হাজতে থাকতে হয়েছিল। সম্ভবতঃ বিশ্বামিত্রের কাহিনী স্মরণ ক'রে জমিদার রামলোচন ক্ষান্ত হয়েছিলেন।

হেমা এখন নির্বিঘ্নে চরে বেড়ায়! কিন্তু পৈতা, নামাবলী আর টিঁকি দেখতে পেলেই শিঙ উঁচিয়ে মারতে আসে।

রাস্তায়-ঘাটে পৈতা, নামাবলী আর টিঁকি বড় দেখতে পাইনে। কামধেনুর জাত গিয়েছে!

ভাইভোর্স

শান্তনু মিত্রকে কে না জানে!

সেই শান্তনু মিত্র যে আজ এমনভাবে আমাকে হতভম্ব করে তুলবে তা কোনদিনই ভাবি নি। এখানে-সেখানে আড্ডায়-মজলিশে মাঝে মাঝে তাকে দেখেছি; আলাপ-পরিচয় সামান্যই ছিল। কিন্তু তার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি বন্ধুবান্ধবদের কারো কারো মুখে।

করিতকর্মা লোক সে। স্বাধীনতার উল্লাস-উৎসবে বাংলার পূর্বপ্রান্তে জিন্দাবাদ আর আল্লা-হো-আকবর জয়ধ্বনির মধ্যে পৈতৃক প্রাণটুকু নিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে যাদের পশ্চিমমুখে ছুটতে হয়েছিল, শান্তনু মিত্র তাদেরই একজন; তথাপি তার এ পশ্চিমমুখী অভিযানের মধ্যেও একটা বিশেষত্ব ছিল।

বুড়ো বাপ-মা শান্তনু মিত্রের এ অভিযানের সঙ্গী হন নি। পাড়াগাঁয়ের মাষ্টার তার বাবা; অত শত তিনি বুঝেন নি; আর হিল্লীদিল্লী, কলকাতার কোন খবরই তিনি রাখতেন না। গফুর দারোগা ত তাঁরই ছাত্র; আর ওই ইয়াকুব চৌধুরী; এখন সে মন্ত্রী হয়েছে; তাঁকে গড়ে পিটে তুলেছেন ভবানী মাষ্টার; কত চড়চাপড় আর কানমলা খেয়েছে তাঁর হাতে। তাঁদের ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটে ছাড়বেন? এ হতে পারে না।

ইয়াকুব চৌধুরীর আনুকুল্যেই শান্তনু বগুড়া না রাজসাহীর কোন এক কলেজে দু'বছর পড়েছে। বড় চালাক-চতুর ছিল

সে; প্রথম বছরেই দল পাকিয়ে ভোটের জোরে কলেজ-ম্যাগাজিনের এডিটার হয়ে বসেছিল। কলেজে প্রায়ই একটা না একটা বার্ষিকী কিংবা উৎসব লেগেই থাকত—এমাসে বঙ্কিম-বার্ষিকী, ওমাসে রবীন্দ্র-উৎসব, নজরুল বার্ষিকী—আরো কত উৎসব। শান্তনু আর ইয়াকুব চৌধুরীর ছেলে আবদুল্লা ছিল তার পাণ্ডা। কলকাতা থেকে পালাক্রমে এক এক করে আনা হ'ত কোন সাহিত্যিক কিংবা সাংবাদিককে সে সব অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে। শান্তনু তাঁদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিত; তারপর চিঠিপত্র লেখালেখি করে তা আরো জোড়ালো করে তুলত। সুতরাং ট্রাম, বাস, গাড়ী, ঘোড়া ও বিচিত্র ইমারত-অধ্যুষিত কলকাতার জনারণ্যের বাধার মধ্যেও শান্তনু বেকায়দায় পড়েনি। চাকরীও পেয়ে গেল সে।

শান্তনু মিত্রের গুণ ছিল অনেক; বড় আজ্ঞাধীন সে। কথাবার্তাও বেশ বলে। সমাজসেবার কাজেও তার জুড়িদার কম মিলে; সকলেই তার প্রশংসা করে। যখন দলে দলে উদ্বাস্তু এসে শিয়ালদা ষ্টেশনে ভিড় জমাতে লাগল, শান্তনু তখন স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে তাদের সেবায় লেগে গেল। তার কাজকর্ম দেখে অনেকের দৃষ্টি তার উপর পড়ল। সরকারী মহলেও তার হিতৈষী অনেকে জুটে গেলেন। এমনি করেই শান্তনু মিত্রের পসার বাড়তে থাকে।

বয়স তার ত্রিশের কাছাকাছি হতে পারে। ন'মাসে-ছ'মাসে চুল ছাঁটে; অবশ্য মাথায় চুল নেই বললেও চলে: দাড়ির অবস্থাও তাই। কাপড়জামা প্রায়ই দেখি আধময়লা। বিড়ি-

সিগারেট খায় বলে জানি নে; কিন্তু মুখভরতি পান তার সব সময়ই থাকে। উপরের দিকে মুখ করে চলে সে; যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে আনমনা চলেছে। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেন, শান্তনু কোন্‌দিন 'পরমহংস-টংস' হয়ে বসবে।

শান্তনু আমাকে এড়িয়ে চলত; একদিন আশুদা বললেন, "দেখুন ত ওর হাতটা; শান্তনুর কি বিয়ে-টিয়ে হবে না?" শান্তনু তাঁর কথা শুনে মাথায় দু'হাত ঠেকিয়ে বললে, 'আমায় মাপ করুন; ওদিকে আমার কোন ঝোঁকই নেই; বিয়ে আমি করব না।' আরো কত কথা হয়েছিল সেদিন, সে সব শুনে শান্তনুর উপর বেশ শ্রদ্ধাই হয়েছিল।

তারপর অনেকদিন শান্তনু মিত্রকে দেখি নি। দমদমে এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছি; বাসে ঠাসাঠাসির মধ্যে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়ল; এ কি শান্তনু মিত্র যে! দিব্বি ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড় ও দাড়িগোঁপ-কামানো; সেই আধ-টেকো মাথায়ও বেশ বাহারের চুলছাঁটা। তারই পাশে একটি তরুণী। দু'সীটের একটি বেঞ্চিতে দু'জনে বসে আছে, হাসাহাসি আর ফিস্‌ফাস্ কথাবার্তা চলছে দু'জনের মধ্যে। মেয়েটি দু'একবার পিছন ফিরে তাকাল। রোগা, ময়লা ও পাঁকাটির মত তার চেহারা; মুখখানিতে বাংলা পাঁচের মত একটা ধাঁচ রয়েছে। এত লোকের মাঝখানে তাঁদের আলাপ-আচরণ আমায় ঘামিয়ে তুললে। আমি যথাস্থানে নেমে পড়লুম; ভাগ্যিস্, শান্তনু একবারও পিছন ফিরে তাকায় নি!

ভাবলুম,—কালের কি বিচিত্র গতি! হয়ত কোনদিন দেখব আমারই ছেলে এরকম কোন তরুণীর সহযাত্রী হয়ে ট্রাম-বাসের সীট দখল করে বসে আছে। সেদিন সন্ধ্যায় পার্কের ওই ঝোপের ধারে বেঞ্চির দিকে তাকাতে গিয়ে ত লজ্জায় মাথা কাটা যায়; আমাদের বিশুদার ছেলে অজিত আর এক তরুণী—! সন্ধ্যার পর পার্কে বেড়ান ত সেদিন থেকে ছেড়েই দিয়েছি; এ বয়সে ট্রামে-বাসে চলাও আমাদের সাজে না; এতদিন পরে তাও বুঝলুম।

যাক্, সেই শান্তনু মিত্র আজ এসে হাজির।

"দাদা, আপনার ঠিকানাটা যোগাড় করতে বড্ড বেগ পেতে হয়েছে; অনেকেই বাড়ী জানেন, অথচ বাড়ীর নম্বরটা জানেন না; ভাগ্যিস্ অভয়দার সঙ্গে দেখা!"

"বেশ, বস; আজ হঠাৎ কি মনে করে?"

"অনেকদিন থেকেই ভাবছি, আপনার সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু সময় হয়ে উঠে না।"

"ওঃ, তাই না-কি? বেশ, বেশ, আজকাল সেই অপিসেই চাকরী করছ ত?"

"হাঁ, কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়েছি দাদা, আমায় বাঁচান" —শান্তনু মিত্র হঠাৎ হাঁটু গেড়ে আমার পা দু'খানি জড়িয়ে ধরল।

"এ কি ভাই! কি হয়েছে আমায় বল!" আমি তার হাত ধরে টেনে তুললুম।

শান্তনু বললে, "বড় বিপদে পড়েছি দাদা। না একূল না

ওকুল। এখন সবই যায়। বিয়ে করেছিলুম ; এখন আইনের প্যাঁচে পড়েছি : আমার হাতটা দেখুন, আমার অদৃষ্টে কি দুর্ভোগ আছে ?"

বিস্মিত হলুম তার কথা শুনে : "বিয়ে ? তুমি আবার বিয়ে করলে কবে ? বেশ, বেশ, কিন্তু ভাই, আমরা যে বঞ্চিত হলুম।"

"না, না, আমি নিজেই বঞ্চিত হয়েছি ; বিয়েটা ভেঙ্গে গেছে। আর আমার কপালটাও ভাঙতে বসেছে।"—অধীর হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে শান্তনু মিত্র।

আমি বললুম, "সবটা আমায় খুলে বল ; দেখছি, এখন তোমার সময়টা ভাল নয় ; সবদিক দিয়েই ঝামেলা দেখা দিতে পারে।"

শান্তনু বললে, "দেখা দিয়েছে দাদা। স্বপ্নেও যা ভাবি নি, তাই ঘটেছে। একটা মেয়ে আমাকে বড় ধাপ্পা দিয়েছে। সোস্যালসার্ভিস করতুম কি না।—ওই উদ্বাস্তুদের মধ্যে। বড় গরীবের মেয়ে ; বাপ মা আর ছোট ছোট ভাই বোন রয়েছে। বাপকে টাইফয়েডে ধরেছিল ; মরতেই বসেছিল ভদ্রলোক। অনেক কষ্টে তাঁকে বাঁচানো গেছে। সহায়সম্বল তাদের কিছুই ছিল না। কত চোখের জল ফেলত মেয়েটি। সে-ই ছিল বড় ; কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। দত্তসাহেবকে বলে তার একটা চাকুরীও করে দিয়েছি। কত চুরি করেছি তাদের জন্যে।"

আমি বললুম, "একটা দুঃস্থ পরিবারের উপকার করেছ, সে-ত ভাল কাজই করেছ।"

সে উত্তর দিল, "আরো শুনুন, এরকম করে কয়েক মাস

কেটে গেল, তাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশ বেড়ে চলল ; মেয়েটি নিজে থেকেই বিয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল ; কত চিঠি আছে তার। আমি জামিন থেকে দত্তসাহেবকে ধরে 'লোনও' পাইয়ে দিলুম। আমাদের বিয়েতে সামাজিক বাধাও ছিল অনেক। তারা একটু উঁচু ; কিন্তু এরকম মেয়ের বিয়ে হওয়াও অসম্ভব ছিল।"

আমার চোখের সামনে সেই বাসে-দেখা বাংলার পাঁচ মুখখানি ভাসতে লাগল ; শান্তনুকে বললুম, "বিয়ে করেছ ভালই করেছ ; শুধু রূপ দেখলে চলে না ; গুণ থাকলেই হ'ল। দুঃস্থ ঘরের মেয়ে নিশ্চয়ই ভাল হবে।"

শান্তনু উত্তেজিত হয়ে বললে, "হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছিলুম ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হ'ল না ? ওর ওই বুড়ো বাপমা যত গণ্ডগোল বাধিয়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন, কি হয়েছে ?"

সে বললে, "আমরা দুজনে ঠিক করেছিলুম কারো বাপ মাকে কিছুই জানতে দেবো না ; যথারীতি রেজেষ্ট্রী করেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কেউ কিছুই জানত না ; মাসখানেক পরেই সে গা-ঢাকা দিলে। তার দেখাই পাওয়া যায় না।"

আমি বললুম, "কেন, তাদের বাড়ী যেতে ত তোমার কোন বাধাই ছিল না।"

সে বললে, "ছিল না বটে, কিন্তু বিয়ে হবার পর আমারও কেমন একটা সংকোচ এ'ল ; ওদের সামনে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পারতুম না ; যাওয়া আসা কমিয়ে দিলুম।"

আমি বললুম, "তার কোন খোঁজ তুমি কর নি?"

সে উত্তর দিল, "করেছি বৈকি? একদিন ত তার বাবা আমাকে দস্তুরমত অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।"

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার অপরাধ?"

সে বললে, "আমি নাকি জোর করে তার মেয়েকে বিয়ে করেছি।—তার সর্বনাশ করেছি।"

আমি বললুম, "তারপর কি হল? মেয়েটির দেখা পেলে না?"

সে বললে, "হ্যাঁ, একদিন অপিস যাবার পথে দেখা হয়েছিল; আমায় বললে, 'তুমি আমায় ভুলে যাও।' তারপর হন হন করে ছুটে চলে গেল।"

আমি বললুম, "মনে হচ্ছে মেয়েটি এখনও তোমার অনুগতা।"

সে বললে, "কি করে বুঝব বলুন? কয়েকদিন পর ম্যারেজ-রেজিষ্ট্রারের একখানা চিঠি এল—ডাইভোর্সের নোটিশ। মেয়ের বাপমা নালিশ করেছে; জোর করে তাদের মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি।"

আমি বললুম, "তা প্রমাণ করা ত চাই। আর আইন-কানুন ত আছে; আর মেয়েটি যখন তোমারই দিকে।"

"না, না, তার আর দেখাই পাইনে; এ একটা বিরাট ষড়যন্ত্র! তারা আমায় ঠকিয়েছে! কালো, কুৎসিত দেখতে সে: শুধু দয়া করে মানবতার দিক থেকেই আমি সায় দিয়েছিলুম। সং-কুলীন ঘরের ছেলে আমি; এখনও চার-পাঁচ হাজার টাকা

ডাউরী পেতে পারি! আমার বাবাকে অনেকে সাধ্যিসাধনা করছে আমারই জন্যে! আইনের মাথায় ঝাঁটা মারি; কোর্ট থেকে বলে দিয়েছে চার বছর দু'জনের কেউ বিয়ে করতে পারবে না: তারপব হবে জাজমেণ্ট!"—শান্তনু মিত্র প্রায় কেঁদে ফেললে।

তার কথায় দুঃখ হ'ল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "আরে ছিঃ, ছিঃ, কেঁদে ফেললে তুমি! মেয়েটি হয়ত বাপমায়ের ভয়ে চুপ করে আছে। একটু অপেক্ষা করেই দেখো না; সব মিট-মাট হয়ে যেতে পারে।"

শান্তনু বললে, "আপনার কাছে এসেছি; কোন আকর্ষণী কবচ-টবচ দিয়ে তাদের মন ফেরানো যায় না দাদা?"

হেসে বললুম, "না ভাই, এ রকম কিছু আমার জানা থাকলে নিজেই আকর্ষণী-কবচ লাগিয়ে সবার চমক লাগিয়ে দিতুম।"

সে বললে, "আমি যে আর পারিনে দাদা! বুঝেন ত এ বয়সে মানুষের কি অবস্থাটা হয়! চার-পাঁচ বছর যে বিয়েই করতে পারব না। আর কুপথে যাবার কোন উপায়ও নেই। দশজনের সামনে মুখ দেখাবো কি করে?"

আমি বললুম, "কেন, ডাইভোর্স হয়ে গেলেই ইচ্ছে থাকলে বিয়ে করতে পার।"

সে বললে, "বললুম না, পাঁচ বছর বসে থাকতে হবে; এখন হিন্দুমতেও আর বিয়ে করা চলে না; নতুন আইন বড় সর্বনেশে আইন!"

নতুন আইনের বিশেষ খবরও রাখিনে; আর এই বয়সে

তার খবর রাখার কোন দরকারও নেই। কিন্তু শান্তনুর জন্য দুঃখ হ'ল। আহা বেচারা! তার হাতের রেখা মনোযোগের সঙ্গে দেখে বললুম, "সত্যি তোমার সময়টা খারাপ; বছর দুয়েক একটু বুঝে-সমঝে চলো।"

শান্তনু বললে, "আচ্ছা, দেখুন ত আমার চাকরীটা কি থাকবে? সন্ন্যাসী-বিবাগী হবার কোন লক্ষণ-টক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন কি?"

বুঝলুম শান্তনু বড় ঘাবড়ে গেছে; মনে বড় আঘাত দিয়েছে সে মেয়েটি। কিন্তু দোষ কার বুঝতে পারলুম না। দুজনে বেশ ক'বছর বুঝাপড়া করে তারপর বিয়েতে রাজী হয়েছে। দুঃস্থ পরিবারের মেয়ে; সব দিক থেকেই তারা দুঃস্থ। শান্তনুর কাছে তারা নানাভাবে কৃতজ্ঞ। তার সঙ্গে এরূপ প্রতারণা করার কোন হেতুই থাকতে পারে না। তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, "কেন এত ঘাবড়ে যাচ্ছ? তোমার চাকুরী থাকবে না কেন?"

"সেও থাকবে না দাদা, পুষ্পকে ত আমি ডাইভোর্স করিনি; সে-ই আমাকে ডাইভোর্স করেছে; এবার বোধ হয় চাকরীও আমাকে ডাইভোর্স করবে।"—হতাশা ফুটে উঠে তার কণ্ঠস্বরে।

"ওঃ, তার নাম বুঝি পুষ্প? তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? হয় ত মেয়েটির কোন দোষ নেই। আর একটা কথা ভুললে চলবে কেন? বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে সামাজিক ভয় অনেকেরই আছে। এটাও একটা হেতু হতে পারে।"—সান্ত্বনা দিই শান্তনুকে।

শান্তনু বলে, "আমিও তা বুঝি ; তার জন্যই আমরা চুপি চুপি কাজটা সেরে রেখেছিলুম ; তারাও চুপ করে গেলে পারত।"

শান্তনুর কথায় হাসি আসে ; আকস্মিক আঘাতের উত্তেজনা কয়জন সামলাতে পারে ? দুঃস্থ সর্বহারা উদ্বাস্তু কুঁড়ে ঘরে আছে পরের দয়ার উপর নির্ভর করে; তারও আছে সামাজিক আভিজাত্যের গর্ব বা ভয় ! তাকে বললুম, "দুদিন যাক্‌, সব ঠিক হয়ে যাবে ভাই, তুমি সবুর কর ; সমাজের ভয়েই তারা এত উত্তেজিত হয়েছে।"

"ঝাঁটা মারি সমাজের মাথায়, মরা কেউটের আবার বিষ ! বড় ভুল করেছি দাদা ! কত ভাল জায়গা থেকে সম্পর্ক এসেছে ; কত ভাল ভাল মেয়ে ! ডাউরীও ছিল অনেক,—আমাদের সৎকুলীনের ঘর কি না ? শুধু পুষ্পের জন্যই,—শুধু মানবতার খাতিরে অনেক নীচে নেমে গেছি ; ডুবে গেছি সাত হাত জলের নীচে। আর কোন উপায় নেই। কোন দিন শুনতে পাবেন শান্তনু বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা আসি, নমস্কার।" হঠাৎ সে বেরিয়ে গেল।

শান্তনু মিত্র চলে গেল। জ্যোতির্ময়ীর মনে এমনি কত শান্তনু এসে ঘা দিয়ে যায় ; দুঃখ হয় তাদের জন্যে।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন খবরের কাগজ খুলে বিস্মিত হলুম ; শান্তনু মিত্র আপিসের টাকা ভেঙ্গে পালিয়েছে ; তার নামে পুলিসের হুলিয়া বেরিয়েছে ! বুঝলুম, এবার শান্তনু সকলকে ডাইভোর্স করে সত্যই বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে।

ফাঁকি

বাসন্তীবৌদি ডেকে পাঠিয়েছেন ; বড় জরুরী দরকার।

বৌদির দোর্দণ্ড প্রতাপে বসন্তদা সর্বদা তটস্থ। স্বভাব যায় না মলে। তিন-তিনটা ছেলেমেয়ে ; বড় ছেলে আর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। মেয়ের দিকের নাতনি এখন পূর্ণিমার কাছাকাছি এসে পেঁ াছেছে। খিটিমিটি লেগেই আছে ; বসন্তদা অতিষ্ঠ হয়ে মাঝে মাঝে বানপ্রস্থ অবলম্বনের আয়োজন করেন। কিন্তু সে আর হয়ে উঠে না।

পথে নেমে তাঁদের কথাই ভাবছি ; বসন্ত আর বাসন্তী। সবাই বলত রাজযোটক।—রাধা আর কৃষ্ণ। চেহারায়ও তার সাদৃশ্য মিলত। নামের মিল আর দুর্দান্তপনার মিল দেখেই বাসন্তীবৌদির দিদিমা পিতৃহীনা বাসন্তীকে পিতৃহীন প্রায় নাবালক বসন্তের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। সে আজ তিন যুগের কথা।

বিয়ের দিন প্রায় সমস্তটা দিন বিড়ি-সিগারেট ফুঁকতে না পেরে পনেরো বছরের পাকা ছেলে বসন্তদার প্রাণটা আইঢাই করছিল ; কোন এক ফাঁকে বাসন্তীর দাদা আর বসন্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু হরনাথ চুপিচুপি বিড়ি আর চকমকি নিয়ে গভীর রাত্রে বাসর ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আষাঢ় মাস ; বাইরে ব্যাঙের ডাক আর বাসরে তরুণী বধূ আর কিশোরীদের নাকের আওয়াজের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দুই বন্ধুতে জানালায় বসে

দিব্যি বিড়ি ফুঁকছিল। তাদের ধূম্রজালের সুবাসে নাকি বাসন্তী-বৌদির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারপর বসন্তদার মুখে এক ঘুষি আর হরনাথের দিকে কাচের ফুলদানি ছুঁড়ে মেরেছিল এগারো বৎসরের কনে বউ বাসন্তী। ছুটে গিয়ে বসন্তদা কনে-বউয়ের পিঠে দমাদম কিল বসিয়েছিল ; হৈ-চৈ আর চীৎকার শুনে ছুটে এসেছিলেন দিদিমা। সে গল্প বসন্তদার মুখে অনেক-বারই শুনেছি।

তিন যুগ সংসারধর্ম করেও স্বভাব বদলায়নি দুজনের। বসন্তদা অবশ্য বিড়ি ছেড়ে সিগারেট ধরেছেন ; প্রথম পর্বের সেই চুলাচুলি আর ঘুষাঘুষির পালা অবশ্য ধীরে ধীরে ক্ষান্ত হয়েছে বড় ছেলে পল্টুর আবির্ভাব থেকে। বসন্তদাকে আর পাড়াগাঁয়ের সখের যাত্রা কিংবা থিয়েটারে শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শকুনি সাজতে হয় না। শহরে এখন তাঁর দিব্যি পশার। তিনি এক-জন বিশিষ্ট ব্যক্তি,—ডাক্তার ; এইচ. এম. ডি (হোমিও)। ভদ্র, শান্ত ও সুরুচির পরিবেশ তিনি চান তাঁর পরিবারের মধ্যে। কিন্তু বাসন্তীবৌদির যেন তা সহ্য হয় না। দোষ কার বুঝতে পারিনে। প্রায়ই বসন্তদা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসেন আমার বৈঠকখানায়,—অশ্রাব্য ভাষায় গালি পাড়েন শিক্ষাদীক্ষাহীনা বাসন্তীবৌদির উদ্দেশে ; অবশ্য চুপি-চুপি আমার কাছেই। আর মাঝে মাঝে উত্তেজনায় নিজের মাথার চুল প্রায় উপড়াতে থাকেন।

সান্ত্বনা দেই বসন্তদাকে। তিনি আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেন ; তাঁর মর্যাদা যে রসাতলে যেতে বসেছে। কত সম্ভ্রান্ত

ঘরের বউ-ঝি আসে তাঁর বাড়ীতে। তারা যদি শোনে কোন-দিন ? ঘণ্টাখানেক পর তাঁর রাগ পড়ে যায়। আবার হন্তদন্ত হয়ে বাড়ী ছুটেন। রোগী ফিরে যাবে যে। বড়লোক সব রোগী। কাঁকিনাড়ার রাজবধূ আর মিষ্টার লাহিড়ী।

আগেই বলেছি, স্বভাব যায় না মলে। যাত্রা-থিয়েটারের বাতিক এখনও বসন্তদার যায়নি। ইদানীং শুনেছি নাটক-নভেলও লিখছেন; সেদিন বাসন্তীবৌদি ঠিকুজী নিতে এসে বলে গেছেন, "রাতদিন কেবল লেখে, তিন চার ঝাঁকা কাগজ লিখে ফেলেছে; কিন্তু কেউ ছাপতে চায় না। সেদিন কোথায় ঝাঁকামুটে করে খাতাগুলো নিয়ে গেল; কাবা নাকি বলেছে ওর নাটক সিনেমায় তুলবে।"

এমন কি রীতিমত থিয়েটার ও সিনেমাওয়ালাদের সঙ্গেও নাকি বসন্তদার বেশ ভাব হয়ে গেছে। অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দের দু'চারজনকে চা পানেও আপ্যায়িত করেছেন বসন্ত ডাক্তার। কিন্তু এসব ভাবসাব বাসন্তীবৌদির পছন্দ নয়; কে একজন মেয়েছেলে নাকি বসন্তদাকে ভুলিয়েছে কাগজ বের করবে বলে; সে কাগজে বসন্তদার লেখা বেরুবে। অনেক টাকা দিয়েছেন বসন্তদা। মেয়েটি এলেই নাকি সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়; দরজা ভেজিয়ে দিয়ে পড়ে শুনান নিজের লেখা—রীতিমত উচ্ছ্বাস আর আবেগের ঢেউ খেলে সে ঘরে। বাসন্তীবৌদির আর সহ্য হয় না।

মানুষটাকে ত তাঁর. চিনতে বাকী নেই; আর ওই যাত্রা-থিয়েটার কিংবা সিনেমায় যারা নামে তাদের কথা জানতেও

বাসন্তীবৌদির কিছুই বাকী নেই। রীতিমত শুনেছি খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যায় বাড়ীতে। বসন্তদা নিজেই খবরগুলো আমাকে পরিবেশন করতেন। ইদানীং তিন চার মাস তাঁকে আর দেখতে পাই না; নিশ্চয়ই সন্ধি-টন্ধি হয়ে গেছে। কিন্তু বৌদিকে ত জানি, তিনি পঞ্চদশীর সঙ্গে পঞ্চাশীপুরুষের মেশামিশি পছন্দ করেন না।

ইতিহাস জানি বলেই কৌতূহল বাড়তে লাগল; দোতলার ঘরে বসন্তদা' রয়েছেন। বাড়ীর চাকর সুখন বললে, "বাবুর ভারি অসুখ। মা বলেছেন, আপনি এলে আগে তাঁকে খবর দিতে।" সুখন উপরে চলে গেল। মিনিট কয়েক পরে বাসন্তীবৌদি নেমে এলেন; লালপেড়ে গরদের শাড়ী তাঁর পরনে। কপালের উপর থেকে সরে গিয়েছে গুণ্ঠন; সিঁদুরের চওড়া রেখা জ্বলজ্বল করছে। রাশি রাশি কুঞ্চন দেখা দিয়েছে মুখে। চোখ দু'টি তাঁর ছলছল।

"বৌদি, ব্যাপার কি? দাদার কি শরীর খারাপ!"

"না ভাই, তাঁর শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? আমারই কপালের দোষ সব।"

"কেন? কি হয়েছে বলুন! সকালবেলা সুখনকে পাঠিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ পাঠিয়েছিলাম। ওঁর ঘরে যাবার আগে আমার একটা কথা শুনুন, তা কিন্তু রাখতে হবে।"

"বলুন, আপনাদের যাতে উপকার হয়, নিশ্চয়ই আমি তাই করব।"

"বেশ, ওঁকে বুঝিয়ে বলুন, ওঁর কোন কাজে আমরা বাধা দেবো না। শুধু এই মাতুলীটা বাঁধতে হবে।"

"কিসের মাতুলী বৌদি ?"

"আপনি জানেন না বুঝি, এক সাধু এসে বলে গেছে, তিন মাসের মধ্যে ওঁর ফাঁড়া আছে।"

"ফাঁড়া আছে ? তারপর—আপনার বিশ্বাস হ'ল ?"

"তারপর আর কি ? আমার হাত দেখে আমাদের সকল কথাই বলে ফেললে আগাগোড়া ; যা কারো জানবার কথা নয় এমন সব কথা। এমন কি (বৌদি আমতা আমতা করে বলতে লাগলেন), এমন কি আমাদের সেই বাসর-ঘরের কথা পর্যন্ত।"

"বেশ, আমারও বিশ্বাস হচ্ছে। কেউ কেউ বলতে পারে বটে। কলকাতায় এরকম কত জোচ্চোর ঘুরে বেড়ায় ; বাড়ীতে বেটাছেলে না থাকলে সাধুসন্ন্যাসীর বেশে নানা কথায় ভুলিয়ে মেয়েদের ঠকিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে যায়।"

আমার কথা শুনে বাসন্তী বৌদি বিরক্ত হলেন ; তিনি বলে উঠলেন, "কি বলছেন আপনি ? তিনি সে রকম লোকই নন ; টাকাকড়ি তিনি ঠকিয়ে নেবেন কেন ? এরকম লোকের সাক্ষাৎ পেলে লোক ধন্যি হয়ে যায়। অকাট্য ফাঁড়া—বাবা দয়া করে এই মাতুলীটা দিয়ে গেছেন। আর বলে গেছেন, তোর স্বামীর এই ফাঁড়া কেটে গেলে শতায়ু হবে। দেশের লোকের মুখে মুখে তার নাম ছড়াবে ; খবরদার তার কোন ইচ্ছায় বাধা দিসনি।"

বাসন্তীবৌদির কথায় বিস্মিত হলাম। তাঁকে বললাম, "বেশ, দাদার হাতে পরিয়ে দিলেই পারেন।"

বৌদি বললেন, "তিনি পরতে চাইছেন না ; সাধু চলে যাওয়ার তিনদিন পরই তিনি শয্যাশায়ী হয়েছেন ; খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ ; শুধু দুধ আর ফল খাচ্ছেন। কথা কম বলেন। তাও খুব আস্তে আস্তে।"

আমি সকৌতুকে বললাম, "ডাক্তার ডাকলেন না কেন ?"

বৌদি মাথায় হাত ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে যেন প্রণাম করে বললেন, "ওরে বাবা, ডাক্তার ডাকতে সাধুবাবার বারণ আছে। ওঁর কাছে বসে আমি শুধু মনে মনে মা দুর্গার জপ করছি।"

একটু চিন্তিত হলাম বৌদির কথা শুনে ; তাঁকে বললাম, "বসন্তদার জ্বরটর হয় নি ত ?"

তিনি বললেন, "জ্বরটর কিছুই নেই ; খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন ; অনীতা খুব সেবা যত্ন করছে ; তার ভরসায়ই রয়েছি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "অনীতা আবার কে ?"

বৌদি বললেন, "অনীতাকে জানেন না ? অনেকদিন থেকে আপনার দাদার কাছে আসে। অনীতাই কাগজ খুলবে। তারই কাগজে আপনার দাদার লেখা বের হবে।"

মনে পড়ল অনীতার কথা ! এই অনীতাই বৌদির অনেক অশান্তির কারণ ছিল ; দু' চোখে তাকে দেখতে পারতেন না। তাকেই বসন্তদা লেখা পড়ে শোনাতেন তাও শুনেছি।

বৌদিকে বললাম, "বড় ছেলেকে খবর দিয়েছেন ?"

তিনি বললেন, "দরকার পড়লে খবর দেবো বৈকি ; কিন্তু বাবা অভয় দিয়ে গেছেন, মাদুলী ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ

শুরু হবে; সাতদিনেই সেরে উঠবেন। আর কোন ভয় থাকবে না। মিছিমিছি এত দূরদেশ থেকে টাকাকড়ি খরচপত্র করে আসবে সে। বৌমা ত এখানেই আছেন। আর দরকারই বা কি? অনীতা আমার মায়ের পেটের বোনের চেয়েও আপন! লেখা-পড়া জানা মেয়ে এমন ভাল হতে পারে তা আমি ধারণাও করতে পারি নি। শুধু কি আপনার দাদার? জোর করে আমায় খাইয়ে দেয়! হাত বুলিয়ে দেয় পায়ে। একঠায় সারারাত বসে বাতাস করে! কি আশ্চর্য মেয়ে!"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, ভালই হয়েছে; আপনার যা শরীর; এর উপর আবার বাতেও ধরেছে।"

তিনি বললেন, "কেউ আমার দুঃখ বোঝে না। পা-টা সারাদিন ছুটাছুটি করে টনটন করে উঠে। বউমাকে ত বলতে পারি নে; শুধু ওই রামুর মা,—ঝি রাঁধুনী দুয়ের কাজ একা করে হাঁপিয়ে ওঠে। থাক ভাই আমার কথা। এখন চলুন, আপনার দাদাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—"

আমি বললাম, "কেন অনীতা পারে না?"

তিনি বললেন, "সে চেষ্টা কি আমরা করি নি? মাদুলীর কথা পাড়লেই আবোল-তাবোল বকেন; কি যে বলেন, বুঝাই যায় না।"

আমি বললাম, "বেশ আমি চেষ্টা করে দেখবো; কিন্তু বসন্তদা এসব ত মোটেই বিশ্বাস করেন না; জ্যোতিষেও তাঁর বিশ্বাস নেই।"

বাসন্তীবৌদি বললেন, "দোহাই ঠাকুরপো, ওঁকে ঝিয়ে

সুঝিয়ে মাছুলীটা পরান। আপনার কথা উনি শুনবেন! আপনার দুটি পায়ে পড়ি।"

"এ কি করছেন বৌদি, আপনি গুরুজন! নিশ্চয় আমি চেষ্টা করবো।"

বাসন্তীবৌদি আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, "আপনি একমাত্র ভরসা। অনীতা পারে নি ; সেও আমার মতই কাঁদছে। আহা! বড় ভাল মেয়ে, কাগজ-কাগজ আর লেখা নিয়েই মত্ত। নিজের জীবনের কথাটা ভাবেই না মেয়েটা!"

অনীতার প্রশস্তি শুনে মনে মনে হাসছি; কিন্তু সাধুর আগমন আর বসন্তদার অসুখ ; তার উপর এই মাদুলী আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। বাসন্তীবৌদিকে শান্ত ও আশ্বস্ত করে দোতালার ঘরে চললাম ; বৌদি অতি সন্তর্পণে আমার আগেই উপরে উঠে গেলেন ; এমন ভান করতে হবে যে, আমি নিজেই হঠাৎ এসে পড়েছি ; বসন্তদার অসুখ-বিসুখের কথা যেন কিছুই জানিনে।

"এসো ভাই, এসো" অতি ক্ষীণকণ্ঠে আহ্বান জানালেন বসন্তদা! তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিলাম, "থাক, থাক, আমি তোমার কাছেই বসব।"

বসন্তদার মাথার কাছেই একখানি টুলের উপর বসে একটি তন্বী তরুণী হাতপাখা নাড়ছে ; পরনে তার ছাপা শাড়ী ; বড় রোগা। মুখশ্রীতে ভাটা পড়ে গেছে। তবু তার মধ্যেও ফুটে উঠছে একটা কমনীয়তা ; একদিনের পঞ্চদশী আজ ত্রিংশতি অতিক্রম করেছে বলে মনে হয়।

তরুণী একপাশে সরে দাঁড়াল; বসন্তদা আস্তে আস্তে বললেন, "দিন ফুরিয়ে এসেছে ভাই, জ্যোতির্ময়ের ডাক এসেছে!"

আমি বললাম, "সে কি বলছেন দাদা! এত তাড়াতাড়ি কি দিন ফুরোয়? কেন, কি কষ্ট হচ্ছে বলুন?"

ম্লান হাসি হেসে বসন্তদা বললেন, "সব ফাঁকি সব ফাঁকি, শুধু জ্যোতির্ময়! তাঁর জ্যোতির মধ্যে সবাই মিলিয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। বুঝলে না? ক্ষিতি, অপ, আর তেজ; সেই তেজের মধ্যেই মিশে যেতে হবে। দুদিন আগু আর পিছু।"

বসন্তদার মুখে আজ তত্ত্বকথা শুনে আশ্চর্য হলাম; ঠাকুরদেবতা কিংবা ভগবানে তাঁর বিশ্বাস আছে বলে কোনদিনই ভাবি নি।

প্রকাশ্যে বললাম, "বসন্তদা, কি কষ্ট হচ্ছে বলুন? আমরা ত ভেবেই অস্থির! বৌদি ত ভেঙ্গেই পড়েছেন। পণ্টুকে খবর দেব কি?" বসন্তদা বললেন, "কে পণ্টু? না, না, না, সবই মিথ্যে, সবই ফাঁকি; সে এসে কি করবে? এমন জ্যোতি এমন শান্তি আমি কোনদিন পাইনি! কি বল অনীতা?"

সংকোচের সঙ্গে এবার তরুণী কথা বললে, "আমাদের কথা রাখুন দাদা, মাদুলীটা পরলে ত জ্যোতি পালিয়ে যাবে না!"

বসন্তদা বললেন, "এমন নির্বেদ শান্তিতে তোমরা বাধা দিতে চাও? কি বল বাসু?"

বাসন্তীবৌদি সজল চোখে বললেন, "বলুন ঠাকুরপো আপনিই বলুন! মাদুলীটা পরলে কি শান্তি চলে যাবে?"

আমি বললাম, "বসন্তদা, সাধু-সিদ্ধ পুরুষের দেওয়া মাদুলী। আর তাঁর কথামতই যখন সব মিলে যাচ্ছে; তখন ধারণ করেই দেখুন না।"

বাসন্তীবৌদি জুড়ে দিলেন, "মাদুলীর গুণে ঘরে ঘরে তোমার সুনাম ছড়াবে; তোমার সকল কাজ সফল হবে।"

বসন্তদা বললেন, "যখন তোমাদের একান্তই ইচ্ছা; বিশেষ করে তুমি যখন জ্যোতিষী; জ্যোতিরই সাধক। তখন মিথ্যা এই অসুখের জন্য আরো মিথ্যা এই মাদুলী ধারণ করব! দাও, দাও; কি জ্যোতিঃ! দেখতে পাচ্ছো না?"

বাসন্তীবৌদি মাদুলী এনে আমার হাতে দিলেন। আমি বসন্তদার ডান বাহুতে মাদুলী বেঁধে দিলাম। বসন্তদার মুখে প্রশান্ত হাসি।

তিনি যেন ভাবের ঘোরে বলে উঠলেন, "হে জ্যোতির্ময় তোমার জ্যোতি যেন আমাকে ঘিরে থাকে; শান্তি, শান্তি, শান্তি!"

বাসন্তীবৌদি সাফল্যের আনন্দে মেঝেতে পড়ে কার উদ্দেশে প্রণাম করলেন বুঝতে পারলাম না। তারপর আমাকে বললেন, "বসুন ঠাকুরপো, জলখাবার নিয়ে আসি!"

তিনি চলে গেলেন। অনীতাও একটু সরে গেল। বসন্তদা আমার কানে কানে চুপি চুপি বললেন, "সব ফাঁকি সব ফাঁকি, এছাড়া তোমার বৌদিকে শান্ত করা যেতো না। সাধু মহারাজ সেই থিয়েটারে বশিষ্ঠ সাজে যে, সে!"

পরম তৃপ্তির সঙ্গে জলখাবার খেয়ে বিদায় নিলাম। বিদায় বেলায় সকরুণ কৃতজ্ঞতায় বৌদির চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। বসন্তদা বলে উঠলেন, "বুঝলে ভায়া, এতদিনে সেই জ্যোতির্ময়ের কৃপায় বুঝতে পেরেছি,—সব ফাঁকি, সব ফাঁকি—এ সংসারটাই ফাঁকিতে চলেছে।"

সহমরণ

বল হরি,—হরিবোল!

একসঙ্গে একই খাটে দুটি মৃতদেহ,—স্বামী আর স্ত্রীর। মুহুর্মুহুঃ শাঁখ বাজছে; উপর থেকে পড়ছে ফুলের পাপড়ি আর খই। আশেপাশে লোকের ভিড়; মেয়েদের ভিড়ই বেশী। সহমৃতা সতীনারী; ভিড় হবে বৈ কি?

বারবার শববাহীদের থামতে হচ্ছে। মেয়েরা আলতা সিঁদুর মৃতার পায়ে ঢেলে দিচ্ছে। কি সৌভাগ্য সে নারীর! কেউ কেউ আবার তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। আবার কেউ বা পাতাভরা সিঁদুর তার পায়ে ঠেকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সতীর পা-ছোঁয়ানো সিঁদুর কত পবিত্র! কত মাহাত্ম্য তার!

সতীনারী; স্বামীর মৃত্যুর ঠিক ঘণ্টা খানেক আগে দেহ রেখেছে। আহা-হা; এযুগে এমনটি দেখা যায় না! সাক্ষাৎ ভগবতী সতী কৈলাস থেকে নেমে এসেছেন। কত জন কত কথা বলে!

বল হরি, হরিবোল!

বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠে এ চীৎকার শুনে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তমসার সহমরণ যাত্রা দেখছি। শুনেছি অনেক, দেখেছিও অনেক কিছু! কিন্তু এ কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি পেলেও কষ্ট হয়! আহা বেচারী তমসা! তার উপর এই

সতীত্বের বোঝা চাপিয়ে আজ যেন তাকে আরো নির্যাতন করা হচ্ছে ; এ যে মরার উপর খাড়ার ঘা।

ঐ যে তমসার মুখখানা দেখা যাচ্ছে। কপালের উপর ঐ গভীর কাটার দাগটা এখনও জ্বলজ্বল করছে! সাত বছরেও তা মুছে যায় নি। তার মাতাল স্বামী গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিল সাত বছর আগে। তারপর কত দুর্যোগ কেটে গেছে!

উদ্ভিন্ন যৌবন থেকে একে একে দশটি বছর তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। কত লাঞ্ছনা আর নির্যাতন সহ্য করেছে সে! কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব পালটে গেছে। অপয়া, অলক্ষ্মী, কলঙ্কিনী তমসা এখন সতীলক্ষ্মীব আসনে সমাসীনা ; এই দেহটায় যদি প্রাণ থাকত, যদি মৃতেরা জীবিতদের এ বিলাপ উন্মাদনা শুনতে পেত বা দেখতে পেত ; তাহলে নিশ্চয়ই গলায় দড়ি দিয়ে আবার মবতে ইচ্ছা হ'ত তাদের!

তমসাব স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেকে এতদিন অনেক কিছু রটিয়েছে ; আজ তারা সকলেই, ঘরের বউ-ঝি কিংবা মায়েরা তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাদেব নারীজন্ম সার্থক করতে ব্যস্ত!

তন্ময় হয়ে ভাবছি আর দেখছি ; হঠাৎ সত্য ডাক্তার বলে উঠল, "ওর শাশুড়ীটাকে আগে বেঁধেছেঁদে চিতায় তুলে দিলে ঠিক হয় ; বুড়ীটা এখন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে,—'ও মাগো ; এদ্দিন তোমায় চিনিনি গো, কেন তুই আমায় ধরা দিলিনি গো! আমার সতীসাধ্বী বেহুলা চলে গেল গো!'—বুঝলেন পণ্ডিত মশাই, ওই বুড়ীটাই যত নষ্টের গোড়া!"

ডাক্তারের কথায় হাসি পায়। জানি, বুড়ীটাই যত নষ্টের

গোড়া। এই শাশুড়ীর জন্যই তমসার জীবনে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার ঢেউ বয়ে গেছে। তবুও মনে হ'ল শাশুড়ীর দোষ নেই এ ব্যাপারে। এর পিছনে আরো কিছু রয়েছে। সত্যিই কি সে স্বামীর শোকে আত্মহারা হয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে এনেছে; না, না, তা হতে পারে না। এইত কয়েকদিন আগে তমসা আমার কাছে এসেছিল; তার করুণ কণ্ঠ এখনও আর্তনাদের মত আমার কানে বাজছে,—"বলুন দাদা, আমার কি হবে!"

একদিন দুপুর বেলা তমসা লুকিয়ে আমার কাছে এসেছিল। চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে। শীর্ণ হয়ে গেছে দেহখানি। তবুও তার মুখে চোখে কি যেন একরূপ লাবণ্যের ছোঁয়াচ লেগেছিল।

বড় সংকোচের সঙ্গে প্রশ্নটা করেছিল সে। তার জন্মকুণ্ডলী হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছি; সত্যই মেয়েটি বড় নিঃসহায়। আমি ভেবেছিলাম, সাংসারিক সুখশান্তির কথাই সে জানতে চায়। শুনেছিলাম, বিভুপদ বড় অসুস্থ; কি জানি তার কি হয়? কাণাঘুষায় কি একটা কুৎসিত রোগের কথাও শুনেছি। বিভুপদের সঙ্গেই তমসার বিয়ে হয়েছিল; সে দশ বছর আগেকার কথা।

তমসা জিজ্ঞাসা করে, "কি দেখলেন দাদা?"

"কি জানতে চাও বল? এরকমই যাবে কিছুদিন।"

"তা জানতে চাইনি আমি! আমার যেরকম যাবে সেটা আমি জানি। তবে যে সত্য ডাক্তার বলেছিলেন,—"

বলতে গিয়ে তমসা থেমে গেল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বলেছিলেন সত্য ডাক্তার? বিভুপদর কোন ভাল মন্দ?"

"তা আর ডাক্তাব বলবে কি? আমি নিজেই সব জানি। যে কটা দিন বাঁচবে নিজেও জ্বলে পুড়ে মরবে; আমাকেও জ্বালাবে। বড় অসহায় লোকটা, কেউ দেখে না। আব বেশি দিন টিকবে বলেও মনে হয় না।"

"তাই নাকি! তাহলে সত্যি তোমার বড় কষ্ট হবে তমসা, তবু এবার তার মতিগতি অনেকটা ফিরেছিল। শুনেছি, আর ঘর ছেড়ে বের হয় না।"

তমসার মুখে ম্লান হাসি, "আব সে শক্তি থাকলে ত বের হবে দাদা!. তার বিষেব জ্বালায আমি যে এখন জ্বলে মবছি।"

"কেন, কেন? কি হয়েছে; লোকের কি আর অসুখ-বিসুখ করে না? নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে।"

"তার ভালমন্দর সঙ্গে আমাব কোন সম্পর্ক নেই দাদা! আপনি আমাব সন্তান-স্থানটা দেখুন।"—তমসার কণ্ঠে ব্যাকুলতা ও সংকোচ ফুটে উঠল।

"কি হয়েছে? ওঃ বুঝেছি। তাতে কি তমসা?"

"কিছু নয় দাদা, ভাল কি মন্দ তাই দেখুন।"

তমসার সন্তানস্থানে শনি আর কেতু; ভাল নয়, তার উপর মঙ্গলের দৃষ্টি রয়েছে। তাকে উৎসাহ দেবার জন্য বললাম, "দেখো না কি হয়? ভগবান যা করেন মঙ্গলেব জন্য; হয় ত এ বয়সে নির্ভব করবার মত কেউ এসে তোমার কোলে উঠবে।"

"নির্ভর করবার মত? না, না, সত্যি কথা বলুন না দাদা! আমায় লুকোচ্ছেন কেন?"

"লুকোব কেন? সত্যি কথা বলতে কি তোমার সন্তান-স্থানটা বড় দুর্বল; তবু এ বয়সে যখন তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, দুঃখ কষ্ট কম পাও নি তুমি; তখন নিশ্চয়ই ভগবান মুখ তুলে চাইবেন।"

তমসা হেসে বললে, "মুখ তুলে কেউ চাইবে না দাদা! আমারই নিমেষের ভুলে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে; দশ বছর যখন কাটাতে পেরেছিলাম, তখন হয়ত সারাজীবনটাই পারতাম। সে আমার জীবনটা শুধু ব্যর্থ করে দেয় নি; চরম অভিশাপ বয়ে এখন সারাজীবন আমায় চলতে হবে!"

"কেন তমসা, কেন এমন কথা বলছ?"

"আমায় লুকোবেন না দাদা, আমি জানি যে-ই আসুক সে একটা অভিশাপ; এ রোগে যাকে ধরেছে, তার বংশধরেরা বইবে বাপের দুষ্কৃতির চিহ্ন—কাণা, খোঁড়া, অঙ্গহীন হতে পারে তারা; দগদগে ঘা পচিয়ে মারতে পারে তাদের—।"

"এত কথা কোথায় শিখেছ তমসা! তুমি কি আজকাল ডাক্তারী পড়ছ?"—হেসে উড়িয়ে দিতে চাই তার কথা।

তমসা বলে,—"জানি দাদা, সব জানি,—ওই করালীর ছেলেদের ত ছোটবেলা থেকে দেখেছি।"

ধমক দিয়ে বলি, "তাতে হয়েছে কি? করালীর ছেলেদের হয়েছে বলে কি সবারই হবে?"

দৃঢ়কণ্ঠে তমসা বলে, "হবে, নিশ্চয়ই হবে। ডাক্তার আমায় বলেছে। সাবধান করে দিয়ে গেছে।"

হেসে বলি, "বেশ সাবধান থেকো—।"

তমসার আর্তকণ্ঠে বেরিয়ে এ'ল, "আর হয় না দাদা। দশ বছর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়েছি; মা মারা গেলে সে লাঞ্ছনা চরমে উঠেছিল; ফিরে এসেছিলাম আমি নিজে যেচে; তবু ত স্বামীর ঘর। কি জানি কেন সে ফিরেও চেয়েছিল এতদিন পর। নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলাম; কিন্তু আজ দেখছি আমায় সে চরম শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে।"

"না, না, বোন! ভয় কি ডাক্তার আছে; ওষুধ আছে।"

"ডাক্তার করবে কি? ডাক্তার বললে ও যদি ভাল হয়, ওর সংসর্গ এড়িয়ে থাকবেন,—এদের বংশধরেরা বাপের দুষ্কৃতির চিহ্ন বহন করে। কিন্তু ডাক্তার জানত না যে অভিশাপ আমি তার আগেই মাথা পেতে নিয়েছি।"

কি উত্তর দেবো ভেবেই পাই নে। সত্যি এরকম হতে পারে। তমসার জন্মকুণ্ডলী তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর যে এতখানি বুঝে বা বুঝতে পেরেছে, তাকে কি সান্ত্বনা দেবো!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, তমসা বলে ওঠে, "বলুন দাদা, আমার কি হবে? এ অভিশাপ ব'য়ে কি সারা জীবনটা আমায় কাটাতে হবে?"

সান্ত্বনার সুরে বলি, "ভয় কি দিদি? মনে রেখো যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন।"

তমসা হেসে উত্তর দেয়, "ভগবান আছেন? কোথায়

ভগবান আমায় বলতে পারেন? আমরা মানুষই সব; যে যাকে পারে, তার উপর অত্যাচার করছে, জোর আর বুদ্ধির জোরে মানুষ চলেছে সবাইকে টেক্কা দিয়ে। ভগবান শুধু একটা বানানো কথা মাত্র,—শুধু সান্ত্বনার কথা।"

"না তমসা, তোমার কথা আমি মানতে পারলাম না। এমন একটা শক্তি রয়েছে আমাদের পিছনে যার ইঙ্গিতে জগৎ চলছে; আমাদের নিজে থেকে কিছুই করবার জো নেই।"

এবার দৃঢ়স্বরে তমসা উত্তর দেয়, "তাহলে দুর্বলের উপর, সহায় সম্বল হীনের উপর এত অত্যাচার কেন?"

উত্তর দিতে পারি নে; জ্যোতিষী আমি; কর্মফলেরই দোহাই দিতে হয়; বলতে হয়—প্রাক্তন। তমসার জন্য দুঃখ হয়; তাকে বলি, "কি করবে বোন! মাথা পেতে বিধাতার বিধান মেনে নিতে হবে।"

"না, না, এ আমি মানব না; তাঁর বিধান তাঁর অভিশাপ আমি মেনে নেবো না।"

"তা হলে কি করবে তুমি?"

ম্লান হাসি খেলে যায় তার মুখে; তবুও দৃঢ়কণ্ঠে সে বলে ওঠে, "দেখি কি করতে পারি! বিধাতাকে কিছুতেই আমি জয়ী হতে দেবো না।"

তমসা চলে গেলো; এখনো তাঁর দৃপ্ত ও আর্তস্বর যেন শুনতে পাচ্ছি—"বিধাতাকে কিছুতেই আমি জয়ী হতে দেবো না।" তাহলে কি তমসা আত্মহত্যা করেছে? নিশ্চয়ই স্বামীর শোকে নয়। স্বামীর জন্য তার একটুও দরদ ছিল না।"

এ পাড়ারই মেয়ে তমসা। দশবারো বছর আগে ও পাড়ার বিভূপদের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, তেরো বছরের মেয়ে তমসাকে বিভূপদর মায়ের হাতে সঁপে দিয়ে তমসার মা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন। গরীব গেরস্ত ঘরের মেয়ে আবার গরীব গেরস্ত ঘরেই পড়ল। কিন্তু শোনা গিয়েছিল, তাদের পৈতৃক বাড়ী আছে ; দু'ভায়ের মধ্যে বিভূপদই বড়। সামান্য লেখাপড়া জানলেও বড় বুদ্ধিমান সে ; দালালি করে বেশ দু'পয়সা ঘরে আনে।

বিভূপদর দালালিই হ'ল তমসার কাল ; সে দিনের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমোয় ; সন্ধ্যেয় বের হয়। তমসা ভাবে, রাতের বেলা আবার কোন দেশী কিসের দালালি ! বিভূপদ কোন দিন বাড়ী আসে, কোনদিন বা আসেই না, তমসা তাদের সংসারে এসেছে, বিভূপদর মায়েরই গরজে, বুড়ী আর তার ছোট ছেলেকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ানোই তমসার কাজ। বিভূপদর সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্কই নেই।

আরো কত কি শুনি পাড়াপড়শীর মুখে। তমসার মা দুঃখ করেন। মেয়েটাকে রাতদিন খাটায় ; ঝি নেই, চাকর নেই ! তবু পেট ভরে খেতে দেয় না। তার উপর মারধোরও করে। দেওরটা পর্যন্ত গায়ে হাত তোলে।

তারপর একদিন শুনলাম, তমসা চলে এসেছে। কপালের উপর গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিল বিভূপদ। মাতাল হয়ে বাড়ী ঢুকেছিল ; জ্ঞানগম্যি ছিল না। এর আগে সে কোনদিন তমসার গায়ে হাত তোলে নি, আর যাই করুক, তমসার কাছেও সে ঘেঁষ ত না। বিভূপদই তমসাকে রেখে গেছে। সাতবছর

তমসার তারা আর কোন খোঁজখবর করে নি। ভায়ের সংসারই তমসা এতদিন আগলেছে; এখানেও লাঞ্ছনা গঞ্জনার সীমা ছিল না, তবুও মায়ের মুখ চেয়েই এতদিন কাটিয়েছিল তমসা। বছর খানেক হ'ল তমসার মা সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন; যাবার বেলা তমসাকে বলে গেছেন, তোর ঘরে তুই ফিরে যাস তমসা, সেটা তোর ভাল হবে, আমি আশীর্বাদ করছি। তবুও তমসা ইতস্তত করেছিল। কিন্তু ভ্রাতৃবধূর নির্যাতনই তাকে এমুখো করতে বাধ্য করলে।

শুনেছি, এখানে তার মন্দ কাটছিল না; অথর্ব শাশুড়ী এখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন; আর বিভুপদর মতিগতি এখন ঘরমুখো হয়েছিল। তারপর আজ মাস খানেক হয় বিভুপদকে রোগে ধরেছিল; চোখে প্রায় দেখে না; কি জানি কি কঠিন রোগে তাকে ধরেছিল; বিভুপদর সেবা শুশ্রূষায় তমসা একটুও অবহেলা করে নি; কিন্তু মুমূর্ষু বিভুপদকে রেখে হঠাৎ তমসা আত্মহত্যা করেছে। একি স্বামীশোক সহ্য করতে হবে না বলে—না অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরের মূর্তি কল্পনা ক'রে, তা বুঝতে পারি নে।

সত্য ডাক্তার মন্তব্য করে—মেয়েটা মরে গেছে, তবুও তার নিস্তার নেই।

শববাহী দলের সঙ্গে হিন্দুস্থানীরা যোগ দিয়েছে—সহমরণের শোভাযাত্রায়। তারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে—সতীমায়ী তামাশা কি জয়!

হাসি পায়—তমসার মৃত্যু আজ সত্যই তামাশায় দাঁড়িয়েছে।

হাসি পায় ; অজিত আর অজাতশত্রু ! হ্যাঁ, অজাতশত্রু বটে ; কিন্তু মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু নহে।

শুনেছি, অজাতশত্রুর জন্মের আগে ও পরে ত্রিকালদর্শী জ্যোতিষীরা নাকি ভবিষ্যদ্বাণী কবেছিলেন, এ ছেলে পিতৃহন্তা হবে। অপোগণ্ড অবস্থায় এ হেন শত্রুকে নাশ করে ফেলতে হিতৈষীরা পরামর্শ দিলেও স্নেহাতুর রাজা কারো কথায় কান দেন নি। এমন কি অহিংসার অবতার বুদ্ধদেবের সুপরামর্শেও এরূপ হিংসাত্মক কার্যে অহিংস বিম্বিসারের বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি হয় নি !

রাজারাজড়াদের কুলপঞ্জী ঘাটাঘাটি করলে এরূপ জাত কিংবা অজাত অনেক শত্রুরই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক অমিয়কান্তি সিকদারের সুগৌর মুখকান্তি যে এরূপ একটা সম্ভাবনায় চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে উঠবে কিংবা তাঁর মধুর দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরাবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

অধ্যাপক অমিয়কান্তির রহস্য কিছু বুঝতে পারি নে ; কয়েক মাস হ'ল, তিনি আমাদের পাড়ায় উঠে এসেছেন। ছোট একখানি বাড়ী, লোকজন নেই বললেও চলে ; একটি মাত্র চাকর আর একটি ঠিকা রাঁধুনি। অমিয়কান্তি কারো সঙ্গে মিশেন না। তিনি বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত তাও জানতাম না। আমাদের বিশুদা একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে

দিয়েছিলেন ; তারপর দু'একবার দেখাসাক্ষাৎও হয়েছে। শুনেছি, তিনি জ্যোতিষীর উপর ভারি চটা ; নাম শুনলেই ক্ষেপে যান। কিন্তু আমি সেরকম কিছুই বুঝতে পারি নি। তবু এটা বুঝতে পারি, তিনি আমাকে এড়িয়েই চলতে চান।

অপ্রত্যাশিত ঘটনা ! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ; শ্রাবণের রাত ; ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরে বসে কি একটা বই পড়ছিলাম ; পাশের ঘরে আমার সেজো মেয়ে সোমার আবৃত্তি মাঝে মাঝে আমার পড়ার তাল ভেঙ্গে দিচ্ছিল—"অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে—।" হঠাৎ পায়ের শব্দে চোখ তুলে দেখি, আমার সামনে অধ্যাপক অমিয়কান্তি ! উস্কখুস্ক তাঁর চেহারা, হাবভাবও উৎকণ্ঠার পরিচয় দেয়। স্বাস্থ্যবান্ পেশীবহুল দৃঢ়কায় অমিয়কান্তি যেন এই বাদলের ঠাণ্ডায়ও ঘেমে উঠেছেন !

"এ কি, অমিয়বাবু ? এ দুর্যোগের মধ্যে কি মনে করে ?"

"নমস্কার পণ্ডিতমশাই, দরকার আছে বলেই এসেছি।"

"বসুন, বসুন ; একেবারে ভিজে গেছেন যে !"

"বড় বিপদে পড়ে ছুটে এসেছি পণ্ডিতমশাই ; কি যে করব ভেবেই ঠিক করতে পারছি নে।"

"এমন কি বিপদ যে আমার মত লোকের সাহায্য দরকার ? বেশ, বলুন।"

"হ্যাঁ বলব, বলবার জন্যেই এসেছি। কিন্তু বড় গোপন কথা। কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না। আমার জীবন-মরণ আপনার কথার উপর নির্ভর করছে।"

অধ্যাপকের কথায় বিস্মিত হলাম। তাঁর যা স্বভাব, তাতে বিশেষ কোন বিপদে না পড়লে তিনি যে এ মুখো হতেন না, তা জানি, তাঁর কথায় উৎকণ্ঠা দেখে ভরসা দিয়ে বললাম, "সে ভয় নেই অমিয়বাবু। কিন্তু আমার কথার উপর আপনার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, একথাটা বুঝতে পারলাম না।"

অধ্যাপক বললেন, "হ্যাঁ, আপনার কথার উপর। দেখুন, পণ্ডিতমশাই, ঐ জ্যোতিষ অর্থাৎ আপনারা যা বলেন কিংবা আপনাদের শাস্ত্রে যা বলে তা কি সত্যই ঠিক?"

"নিশ্চয়ই ঠিক,—অন্ততঃ জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা মিথ্যা হতে পারে না।"

"মিথ্যা হতে পারে না? তাহলে সবই ঠিক ঠিক মিলে যায়?"

"হ্যাঁ মিলে যায় বৈ কি? অবশ্য মিলানোটা জ্যোতিষীর বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। আর নির্ভর করে যার সম্বন্ধে বলা তার সঠিক জন্মকুণ্ডলীর উপর।"

অমিয়কান্তি আমার কথা শুনে আরো ঘামতে লাগলেন। তিনি ব্যাকুল ভাবে বললেন, "তা হলে মিথ্যে বলে নি?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি ত কোন কিছুই বুঝতে পারছি নে। কে কি বলেছে?"

তিনি উত্তর দিলেন, "এই আমার কথা, পণ্ডিত মশাই। আমারই কথা। তা হলে নিশ্চয়ই ভয়ের কারণ আছে?"

অধ্যাপকের কথা হেঁয়ালি ঠেকে; তাঁকে বললাম, "দেখুন, আপনার সম্বন্ধে কে কি বলেছে, তা ত আমি জানি নে। আপনার ঠিকুজী-কোষ্ঠীও আমি কোনদিন দেখি নি।"

তিনি উত্তর দেন, "না, না, আমার ঠিকুজী-কোষ্ঠী কোন কিছুই নেই। আর আমি এসব বিশ্বাসও করি নে। অদৃষ্টে যা আছে ঘটবে। কিন্তু ইদানিং বড় খটকা বেধেছে।"

আমি বললাম, "কাউকে বুঝি হাত দেখিয়েছিলেন?"

অধ্যাপক বললেন, "না, হাতটাত কাউকে দেখাই নি। কিন্তু পণ্ডিতমশাই, পাঁচবছর আমি প্রায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি,—বিশ্বাস করেন?"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, "পাঁচ বছর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সে আবার কি রকম কথা?"

আর্তকণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন, "হ্যাঁ পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আপনার জনকে ধরা দিতেও ভয় হয়। ব্যাঙ্কও মারি নি, তবুও পালিয়ে বেড়াচ্ছি।"

অমিয়কান্তির কথায় স্তম্ভিত হই! ভদ্রলোক বলেন কি? ইতিহাসের অধ্যাপক অমিয়কান্তি; শুনেছি ইতিমধ্যেই বেশ সুনাম করেছেন। এমন কি কারণ থাকতে পারে যে এরকম করে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, আর কলেজে অধ্যাপনা করেন; নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন কি করে? নিশ্চয়ই মাথা খারাপটারাপ হয়েছে! যে রকম নিরিবিলিতে—একা একা থাকেন! আর যে চেহারা ও হাবভাব দেখছি; নিশ্চয়ই ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেছেন! তাঁকে বললাম, "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, অমিয়বাবু; আপনার মত লোককে পালিয়ে থাকতে হবে, এমন কথা আমি ভাবতেও পারি নে।"

ম্লান হাসি ফুটে ওঠে অধ্যাপকের মুখে। তিনি বললেন,

"বিশ্বাস করলেন না পণ্ডিত মশাই ! এ পাঁচ বছরে পাঁচটা কলেজে এবং কম হলেও পঁচিশ জায়গায় বাসা বদল করেছি। শুধু আপনাদের ঐ জ্যোতিষীর কথায়।"

"বলেন কি অমিয়বাবু ? এ যে বিশ্বাস হয় না। ঐ যে বললেন, জ্যোতিষে আপনার বিশ্বাস নেই ! তাহলে—"

"শুধু প্রাণের দায়ে ; বুঝলেন, শুধু প্রাণের দায়ে স্ত্রীপুত্রকেও এড়িয়ে এই পাঁচ বছর কাটিয়েছি। সেই সুচিত্রা—যাঁর কত সাধ আহ্লাদ সংসার সাজাবে ! খোকন আসবে—খোকনের জন্য কত খেলা, কত স্বপ্ন দুজনের। কিন্তু মাত্র একটা আঘাতে, দৈবের একটা অভিশাপে সব চুরমার হয়ে গেল। সুচিত্রার কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয় ! ভয় হয়। আজ সে মরণের পথে। তবুও উপায় নেই ; তাঁকে শেষ দেখা দেখতে যাব, তাতেও সেই বাধা"—অধ্যাপকের চোখ সজল হয়ে উঠল।

অধ্যাপক অমিয়কান্তি যে বিবাহিত, এমন কি তাঁর স্ত্রীপুত্রও রয়েছে, তা জানতাম না। ভাবলাম অধ্যাপক হ'লে কি হয়, লোকটার নিশ্চয়ই মাথায় ছিট্ আছে ; কোন কারণে হয়ত স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে ; নিজের ভুল বুঝতে পেরে এখন অনুতপ্ত হচ্ছে। চুপ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমায় চুপচাপ দেখে অমিয়কান্তি বলতে লাগলেন, "কি ভাবছেন পণ্ডিত মশাই ? আমার কথাগুলোর কদর্থ করবেন না ; আমি তেমন খারাপ লোকও নই। আমার জ্ঞান বিশ্বাস মত আজ পর্যন্ত এমন কোন খারাপ কাজ আমি করি নি, যার জন্যে আমাকে এরকম করতে হচ্ছে।"

মনে মনে বললাম, "পাগলের খেয়াল! তার আবার ভালমন্দ কি?" তারপর তাঁকে সান্ত্বনার স্বরে বললাম, "কি হয়েছে আমায় বলুন, খোকনের কথা, সংসার সাজানোর কথা কি বলছিলেন?"

আকুলভাবে অমিয়কান্তি বললেন, "হ্যাঁ খোকনের কথা বলব। বলবার জন্যেই এসেছি। আজ আমার কাছে আমিই একটা হেঁয়ালি হয়ে পড়েছি। বিয়ে করেছিলাম—সুচিত্রাকে। বিয়ে ক'রে সুখীও হয়েছিলাম। দুজনে তারই প্রতীক্ষায় ছিলেম বহুদিন,—তারপর যখন সে এল, আমাদের স্বপ্ন সার্থক হলেও এক আঘাতে তা চুরমার হয়ে গেল।"

"কি হল? আপনার স্ত্রীর কোন কিছু কিংবা ছেলেটির কোন কিছু অমঙ্গল হয়নি ত?"

অমিয়কান্তি বললেন, "না, না, তাদের কারো কিছু হয় নি। সুচিত্রা এখন লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর বাবার কাছে, ছেলেও সেখানে আছে আজ পাঁচ বছর।"

"তা হলে আপনাদের মধ্যে এরকম বিচ্ছেদের কারণ কি? কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝির ব্যাপার নিশ্চয়ই।"

অমিয়কান্তি বললেন, "না পণ্ডিতমশাই, সেরকম কিছুই ঘটে নি। ভুল যদি বুঝে থাকে এই পাঁচ বছরেই তা হয়েছে: আমারই আচরণে সুচিত্রা হয়ত আমাকে ভুল বুঝেছে। কিন্তু যে কথা কোনদিন কাউকে বলি নি, শুধু প্রাণের দায়ে আপনাকেই বলতে এসেছি; এমন কি সুচিত্রাও তা জানে না। আহা বেচারী! সে হয়ত আমাকে কত নিষ্ঠুর ভাবছে; কিন্তু

সে জানে না, আমার অন্তর দাউ দাউ করে রাতদিন জ্বলছে! নিশ্চয়ই তারা সবাই আমাকে ভুল বুঝেছে। কি করতে পারি পণ্ডিতমশাই? এ ছাড়া যে কোন উপায়ই ছিল না।"

অধ্যাপকের কথায় কৌতূহল বাড়ে; তাঁকে প্রশ্ন করি, "আচ্ছা, এ দীর্ঘ বিচ্ছেদের কারণ জানতে পারি কি? এমন কি ঘটেছিল যে স্ত্রী পুত্র ছেড়ে আজ পাঁচ বছর দূরে দূরে রয়েছেন?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, "আপনাদের জ্যোতিষ পণ্ডিতমশাই! আপনাদের জ্যোতিষ! লক্ষ্ণৌ থেকে টেলিগ্রাম এল, ছেলে হয়েছে; সাধ করে' জ্যোতিষীর কাছে গেলাম, ছেলের ভবিষ্যৎ জানতে। তিনিই শুনালেন, অভিসম্পাতের বাণী।"—ভদ্রলোক মাথায় করাঘাত করলেন।

"অধীর হবেন না, অমিয়বাবু, তারপর কি হ'ল বলুন।"

"জ্যোতিষী কুণ্ডলী এঁকে বললেন, 'কি সর্বনাশ! পাঁচ বৎসর মধ্যে পিতৃরিষ্টি। ছেলে পিতৃঘাতী হবে!' এই দেখুন ছেলের ছক।"

ছেলের ছক হাতে নিয়ে বিস্মিত হয়ে বললাম, "কি বললেন, পাঁচ বছরের মধ্যে? পাঁচ বছরের ছেলে পিতৃঘাতী হবে?"

হতাশার সুরে অমিয়কান্তি বললেন, "হ্যাঁ, বলেছি না; শ্লোকটা এখনও আমার মনে আছে,—

"লগ্নাষ্টম গতে ভৌমে দ্বাদশে পাপ-দ্বিত্রয়ে।
পিতৃঘাতী ভবেন্নিত্যং শুভৈর্যদি ন দৃশ্যতে॥"

অধ্যাপকের কথা শুনে হাসি পেয়ে গেল। "ওঃ, বুঝেছি।

বড় ভুল বুঝেছেন অমিয়বাবু! পাঁচ বছরের ছেলে পিতৃঘাতী হতে পারে না।"

"কেন, কেন পারে না? ধরুন দৈবাৎ খেলার ছলে যদি ধারালো কিছু দিয়ে কোপ বসিয়ে দেয় গলায় কিংবা এমন কোন জায়গায়—" অধ্যাপক আমতা আমতা করতে লাগলেন।

হেসে উত্তর দেই, "তা অবশ্য আশ্চর্য নয়, অমিয়বাবু! পাঁচ বছরের ছেলেও এরকমভাবে কাউকে হত্যাও করতে পারে। কিন্তু এরকম ত আজ পর্যন্ত কোথাও ঘটেছে বলে শুনিনি।"

অধ্যাপক উত্তর দেন, "ঘটেনি বলেই যে ঘটতে পারে না, তা নয়।"

"হাং-হাঃ-হাঃ, আপনার বেলা অন্ততঃ ঘটবে না, এ আমি হলপ্ করে বলতে পারি। আপনি ভুল বুঝেছেন। এটা পিতৃ-রিষ্টির কথা। রিষ্টি মানে ফাঁড়া। ছেলের পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে পিতার ফাঁড়া ছিল। আর যে ছেলের লগ্নে বৃহস্পতি রয়েছে; তার কোন রিষ্টিই থাকতে পারে না। আর জানেন ত, "কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতি।"

অমিয়কান্তি কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "কিন্তু সত্যও হতে পারে ত? অজাতশত্রুর কথা জানেন না?"

"ওঃ, আপনি আবার ইতিহাসের অধ্যাপক ত?"—হেসে উঠি তাঁর কথা শুনে।

তিনি বললেন, "হাসবার কথা নয় পণ্ডিতমশাই; প্রথমে আমিও জ্যোতিষীর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু

যখন ছেলের দিদিমা সাধ করে নাম রাখলেন—অজিতকান্তি, তখনই একটা সংশয় জেগে উঠল। নিশ্চয়ই এটা বিধাতার ইঙ্গিত।"

"সে আবার কি রকম?"

"বুঝলেন না? অজাত ও অজিত! অজিতকান্তি আর অজাতশত্রু? কে যেন সাবধান করে দিল! দৈবের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুচিত্রাকে চিঠি লিখে দিলাম,—'পাঁচ বছর আমার কোন খবর করো না।' সেই থেকে সংশয় আর আতঙ্ক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি পাগলের মত।"

অমিয়কান্তির কথা শুনে হাসি পায়! ইতিহাসের অধ্যাপক। বড় ভুল বুঝেছেন। মনে মনে ভাবি, তাই জ্যোতিষীর উপর ক্ষেপে আছেন! তাঁকে ভরসা দিয়ে বলি, "বড় ভুল বুঝেছেন অমিয়বাবু। কেউ আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে। ইতিহাসের অধ্যাপক কি না—তাই অজিতকান্তি আর অজাত কান্তির মধ্যে মনের আতঙ্কেই মিল দেখেছেন! এটা বোঝেন না? অমিয়কান্তির সঙ্গে তাল রাখবার জন্যেই দিদিমা আদর করে নাম রেখেছেন—অজিতকান্তি! তাতে বিধাতার কোন ইঙ্গিত নাই।"

তিনি আমার কথায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তারপর ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, "তাহলে,—তাহলে, আমি নির্ভয়ে যেতে পারি, আপনি বলুন!"

"কোথা—কোথা যাবেন, তাদের আনতে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতদিন তাঁরা আমার কোন ঠিকানা জানত না;

এবার ওই বিশুদা'ই যত গোলমাল বাঁধিয়েছেন। টেলিগ্রাম এসেছে—স্থচিত্রা মৃত্যু শয্যায়। আমি নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে আর একজনকে প্রাণে মারতে বসেছি। তাহলে কোন ভয় নেই, বলুন।"

আমি জোর দিয়ে বললাম, "নির্ভয়ে যান; এসব বাজে চিন্তা করবেন না। আর পাঁচ বছর ত কেটে গেছে।"

অমিয়কান্তি উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, "আঃ, বাঁচালেন আপনি! আমি রাত এগারোটায় তাহলে দিল্লী এক্সপ্রেস ধরছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্ষুনি যান।"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি; পাঁচ বছর কেটে গেছে। আর কি বলেছিলেন সেই শ্লোকটা?—"কিং কুর্বন্তি—।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতি।"

অধ্যাপক নমস্কার করে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন। রাত তখন দশটা বাজে।

মনে মনে আওড়াতে লাগলাম—অজিত আর অজাত! কি বিড়ম্বনা!

হ্যাঁ, তাইত তুমি ?

বিস্মিত হই যুবকের কথা শুনে। হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে ; সেই রাত্রের কথা। সেই ছেলেটি,—ছিপছিপে পাতলা চেহারা ; ঐ যে ডান দিকের ভুরুর উপর কাটার দাগ। লিক্‌লিকে হাত-পা ; বড় রোগা ছিল সে ; কথায়ও কিছু জড়তা ছিল। সে-ই এখন ঢ্যাঙ্গা হয়েছে। সুগৌর মুখ-খানায় এখনও সেই তেজোদ্দীপ্ত ছবি দেখতে পাচ্ছি। ছয়-সাত বছর চলে গেছে ; সেই দশ-এগারো বছরের ছেলের মধ্যে আজ যৌবনের মায়ামধুর সোনার কাঠির স্পর্শ ফুটে উঠেছে।

পয়সা সে কিছুতেই নেবে না। ষ্টেশনের একপাশে ছোট একখানি চায়ের দোকান। সঙ্গী অধ্যাপক বন্ধু আর আমি দু'কাপ চা আর দু'খানা করে বিস্কুট নিলাম ; দোকানের তরুণ মালিকটি নিজের হাতে চা করে দেয় ; এটা দিই, ওটা দিই,—আদর আপ্যায়নের অন্ত নাই। এটাও স্বাভাবিকই ; বিশেষ করে মফঃস্বলের শহরে গিয়েছি সভা করতে। মনে মনে অহং-ভাব একটু চাড়া দিয়ে উঠে বৈ কি ! তবু যুবকটির স্বভাব বড় মিষ্টি লাগল ; কিন্তু দাম চুকিয়ে দিতে গিয়েই ফ্যাসাদ হল। দাম ও নেবে না। আমরা উঠে দাঁড়াতেই সে পায়ের ধুলো নিয়ে হাসি মুখে বললে, "আমাকে চিনতে পারলেন না ?

আপনাদের জন্যেই আমার জীবনটা বদলে গেছে, ভিক্ষে করে বেড়াতাম ষ্টেশনে ষ্টেশনে।"

আমরা দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। ছেলেটি কি বলতে চায়। আমি উত্তর দিলাম, "না, কিছুই মনে পড়ছে না ত?"

যুবকটি বললে, "সাত বছর আগে আর একবার এখানে আপনারা দু'জনে একসঙ্গে এসেছিলেন।"

মনে পড়ে গেল; উত্তর দিলাম, "হাঁ, এসেছিলাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে একটা সভায়।"

ছেলেটি লজ্জানম্র-স্বরে বললে, "ভুলে গেছেন? আপনিই তখন এক ভিখিরী ছেলের হাত দেখে বলেছিলেন, দোকান কর, ব্যবসা কর, নিশ্চয় তুমি মানুষ হবে।"

অবাক হয়ে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি

সে বললে, "আর উনি আমাকে টাকা দিতে গিয়েছিলেন; মনে নাই আপনার? সেই বিস্কুট ফেরির কথা? দিনের বেলায় ভিক্ষে আর রাত্রে বিস্কুট ফেরি করে বেড়াতাম আমি।"

"হাঁ, হাঁ, তাই ত। মনে পড়েছে।"

ছেলেটিকে দুই বন্ধুতে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বন্ধুবর উচ্ছ্বাসে হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠলেন,—"না, না, তোমাকে আর পয়সা দিতে যাব না। লক্ষ্মী ছেলে লেখাপড়া করছ ত?"

মুখে সেই মিষ্টি হাসি। সে বলে, "সময় কোথায়? তবু গতবার ম্যাট্রিক পাশ ক'রে এখন রাত্রে কমার্স পড়ছি। কিন্তু সত্যি বলছি, পড়াশুনা করতে আমার ভাল লাগে না।"

আবার উচ্ছ্বসিত হাসি অধ্যাপকের মুখে—"ওঃ সেই পুরনো কথা। ভাল লাগে না। সেই গলা। সেই স্বর; হাঁ, মনে পড়ছে। তোমায় কি ভুলতে পারি?"

বছর সাতেক আগে। কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে কলকাতার ফিরতি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি, অধ্যাপক ভট্টাচার্য আর আমি। গিয়েছিলাম একটা সভায়—সভাপতি আর প্রধান অতিথিরূপে।

ট্রেনের দেরী আছে। সময় আর কাটে না। অধ্যাপকবন্ধু আর আরো দুএকজন হাত বাড়িয়ে দেন, "দেখুন ত দাদা, এ জ্বালা আর কদ্দিন? অভাব কি এ জীবনে ঘুচবে না?"

জ্যোতিষের চর্চা করি। তাই এটা-সেটা বলে বন্ধুবান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত অনেকেরই কৌতূহল মিটাতে হয়। সময় অসময় নেই; পত্রিকার অফিস, বইয়ের দোকান, ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম্ কিংবা খেলার মাঠের গ্যালারি।—যারা চেনে, তারাই হাত বাড়ায়।

অধ্যাপক-বন্ধুকে বলি, "কেন ঘুচবে না? এইত রবিরেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতির ক্ষেত্রটাও বেশ পুষ্ট; করতলের বেশ রক্তিম আভা!"

অদূরে তখন আর একটা কাণ্ড ঘটছে। অবশ্য ট্রেনে কিংবা ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে তা নতুন নয়। কিন্তু এ ঘটনার মাঝে একটু নূতনত্ব রয়েছে। একটি ছেলে। মুখে-চোখে কথা কয়। কাঁধে তার একটি টিনের বাক্স ঝুলছে। চাই বিস্কুট, বিস্কুট চাই,—হাঁক দিচ্ছে।

ময়লা একটি জামা তার গায়ে। পরনে ততোধিক ময়লা একটা হাফ-প্যাণ্ট। বড় রোগা, পা দু'খানা দেখা যাচ্ছে বড় লিক্‌লিকে। বিস্কুট নিতেই হবে। নাছোড়বান্দা ছেলে। মুখে মিষ্টি হাসি। তার উপর আবদারে ভরা করুণ আবেদন। সহজে এড়ান যায় না।

"নিন সার, দু'প্যাকেট—মাত্র দু'আনা।"

"কি করব? আমার দরকার নেই।"

"কেন? খিদে পেলে খাবেন। একটা প্যাকেট নিয়ে দেখুন, একটি আনা।"

জোর করে কারো কারো হাতে তুলে দেয়। তারপর পয়সা আদায় করে; বিব্রত হয় অনেকে। কড়া কথাও শুনায়। ধমকাতে গিয়ে কেউ কেউ থেমে যায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

অধ্যাপক বন্ধু বললেন, "বাব্বা, ভিখেরীরও বাড়া। এত ছোট ছেলে! লেখাপড়া করে না। আমাদের বাপ-মায়েরাই সব বজ্জাত। কচি কচি ছেলেকে ভিক্ষে করতে পাঠিয়ে দেয়।"

এবার ছেলেটি আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। অধ্যাপকের কথায় হাসি পায়। রসিকতা করে বলে উঠি, "এবার বুঝুন ঠেলা! বিস্কুট কিনতে হবে।"

অধ্যাপক বন্ধু উত্তেজিত হয়ে উঠেন, "না, না, এ সবের প্রশ্রয় দিতে নেই। পুলিসে দেওয়া দরকার এমন বাপ-মাকে।"

উত্তর দেই, "বাপ মা আছে কি না দেখুন। আর থাকলেও এখানে তাদের পাবেন কোথা?"

তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, "ছিঃ ছিঃ, দেশটা উচ্ছন্নে গেছে। বাঃ রে, আমার স্বাধীন দেশ! চীন কিংবা রাশিয়া ঘুরে আসুন, চোখ খুলে যাবে।"

আমি হেসে উত্তর দেই, "চীনে, কিংবা রাশিয়ায় যেতে হবে না। পাঁচশালা পরিকল্পনায় এ দেশ তাদেরও ছাড়িয়ে যাবে। এদেশে বসেই তা দেখতে পাব।"

অধ্যাপক বন্ধুর কণ্ঠে একটি শব্দ—হোঁম।

ইতিমধ্যে ছেলেটি আমাদের কাছে এসে গেছে। সে এসে আমার সামনে তার হাতটা খুলে ধরলে। মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠি,—এ কি আপদ্! শেষকালে ভিখিরী ছেলেরও হাত দেখতে হবে না কি? কিন্তু তার করুণ চোখ দুটি আমাকে মুগ্ধ করল। ফ্যাকাশে হাতখানি; শীতের হাওয়ায় একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আহা নিতান্ত ছেলেমানুষ। দশ এগারোর বেশী বয়স হবে না।

"দেখুন না একটিবার। আপনার নাম আমি শুনেছি। দেখুন, আমার কি হবে?"

কি আশ্চর্য! এরও হাতে রবিরেখা সুস্পষ্ট! তার সঙ্গে আছে বুধের রেখা। প্রখর বুদ্ধির চালনায় জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার যোগ রয়েছে। কিন্তু এ অবস্থায় কি করে তা হয়? সন্দেহ জাগে মনে। ছেলেটিকে বলি, "তুমি লেখাপড়া কর না কেন খোকা? তোমার কি কেউ নেই?"

তার মুখে ম্লান হাসি খেলে গেল। সে উত্তর দেয়, "পড়াশুনা করবার সময় কোথা?"

"কে আছে তোমার,—বাবা-মা ?"

"মা আছে। আর একটি ছোট ভাই।"

"লেখাপড়া কর না কেন ? এরকম করে কদিন চলবে ?"

"বলছি ত লেখাপড়া করবার মত সময় নেই। আর এরকম না করলে চলবে কি করে ?"

"কেন তোমাদের দেখাশুনা করে এমন বুঝি কেউ নেই ?"

"আছে কি না জানিনে। মা বলে আমাদের ভগবান আছেন।"

"ওঃ, তোমার বাবা বুঝি বেঁচে নেই।"

"হ্যাঁ। বাবার কথা জানি নে।"—ছেলেটির কণ্ঠে আর্তস্বর।

তার কথাটা খচ্ করে মনে বিঁধে। আহা বেচারী! বাবা নেই; সহানুভূতির সুরে বললাম, "কিন্তু এরকম বিস্কুট বিক্রী ক'রে কতই বা পাও ? তিন জনের কি করেই বা চলে ?"

"এতে চলে না। ভিক্ষেও করতে হয়। মা ঠোঙা তৈরী করে। দোকানে দোকানে দিই; তাতেও কিছু হয়।"

অধ্যাপক বন্ধু বিস্মিত হয়ে বললেন, "ভিক্ষে করতে হয় ! না, না, ভিক্ষে করো না। বরং সস্তাদামের দরকারী জিনিস ফিরি করে বেড়াবে। কিন্তু এরকম নয়। যা করছ, তা ভিক্ষেরই সামিল।"

ছেলেটি উত্তর দেয়, "পয়সা কোথা পাব ?"

অধ্যাপক বলেন, "কেন কত আর লাগবে ? মাজন, আলতা, মলম, ধূপকাঠি—আরো কত কি। যা নিত্য মানুষের দরকারে লাগে। তা-ই ফিরি করবে।"

ছেলেটি হাসিমুখে বলে, "চেষ্টা করে দেখব।"

অধ্যাপক আবার বললেন, "তাই করো বাবা, পয়সার জন্যে ভাবনা নেই। কত আর লাগবে? কিন্তু লেখাপড়া করবে। মানুষ হতে চেষ্টা করবে; বুঝলে?"

ছেলেটি ব্যগ্র হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা আপনিই বলুন, আমার হাতে লেখাপড়া আছে কি না? আমি কি মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারব?"

আমি উৎসাহ দিয়ে বলি, "নিশ্চয়ই তুমি পারবে। তুমি মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে। ছোট-খাট চায়ের দোকান করো। এ শরীরে ঘুরাঘুরি সইবে না।"

তার রুচি মুখে হাসি ফুটে উঠে, "তাই করব। কিন্তু লেখাপড়া করতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আর দোকান করব ত ইস্কুলেই যাবো কখন?"

অধ্যাপক বন্ধু বললেন, "তাই ত বড় সমস্যার কথা। দেখো, সকাল বিকাল দোকান করবে; তাহলেই হবে। পড়াশুনা তোমায় করতেই হবে।"

ছেলেটি খিলখিল করে হেসে উঠল। ইতিমধ্যে অধ্যাপক বন্ধু পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিতে গিয়ে বললেন, "এতেই হবে। আমার কথামত কাজ করবে; বুঝলে? এখানকার এস-ডি-ও আমার ছাত্র; তোমায় সুবিধা করে দিতে তাকে বলব।"

এবার ছেলেটির মুখের রূপ পালটে গেল। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সে বললে, "দেখুন সার, এ আমি নিতে পারব না।"

অধ্যাপক বললেন, "কেন ? কেন নিতে পারবে না।"

ছেলেটি উত্তর দেয়, "মিছেমিছি অন্যের পয়সা নিতে মায়ের মানা আছে।"

আমি বললাম, "মিছিমিছি কেন ? তোমার উপকারের জন্যই দিচ্ছেন। তুমি যাতে দাঁড়াতে পারো।"

ছেলেটির কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে উঠে, "না, না, কেন আপনারা আমাকে দিতে যাবেন ? আর আমিই বা নেবো কেন ?"

আমি বললাম, "কেন নেবে না ? তুমি ত ভিক্ষেও কর।"

তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল, "হ্যাঁ করি। যখন দরকার হয়, তখনই ভিক্ষে করতে হয়। এখন ত আমি ভিক্ষে করছি না ; আর এটা ত ভিক্ষেও নয়। ভিখেরীকে কেউ এত টাকা ভিক্ষে দেয় না।"

অধ্যাপক বন্ধু বললেন, "ওরে পাগলা ! ভিক্ষে নয় রে ; তোকে ভালবেসে তোর ভালর জন্যেই এটা দিচ্ছি। যাতে করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিস।"

ছেলেটি উত্তর দেয়, "নিশ্চয়ই পারব। আপনাদের আশীর্বাদ যখন রয়েছে।" তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "ওই ত উনি আমার হাত দেখে বললেন,—আমি মানুষ হব। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব।"

অনেক লোক আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ কানে গেল, "সাবাস ছোক্‌রা ! কেমন মায়ের ছেলে ? দিনের বেলা ভিক্ষে আর রাতের বেলা জবরদস্তি ফেরি।"—একটি হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালা অদূরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

মন্তব্যটা ভাল লাগল না; কিন্তু কিছুই করবার নেই। অধ্যাপক বন্ধু স্নেহমাখা সুরে বললেন, "নিশ্চয় তুমি মানুষ হবে; নিজের পায়ে দাঁড়াবে। আচ্ছা, এটা না হয় পরে আমাকে ফেরত দিও।"

ছেলেটি মিনতির সুরে বলে, "আপনাদের কথাই আমায় জোর দিয়েছে। আমি বামুনের ছেলে। ভিক্ষে করতে আমার লজ্জা নেই। কিন্তু এরকম করে টাকাটা আমি নিতে পারব না, আর আপনি বিশ্বাস করে যে জন্যে টাকাটা দিচ্ছেন, সে কাজে যদি টাকাটা না লাগাই! জানেন ত আমাদের অভাবের সংসার।"

"কেন? তুমি কাজে লাগাবে, ব্যবসা করবে।"

"বলা যায় না সার! এখনই আমার লোভ হচ্ছে বায়স্কোপ দেখি।"—খিলখিল করে হেসে উঠে সে।

আশ্চর্য ছেলে! চোখে মুখে কথা বলে। এ যদি সুযোগ পেতো।—মনে মনে আপসোস হয়। তাকে বলি, "তা হলে টাকাটা তুমি নেবে না?"

দৃঢ়তা ও নম্রতা ফুটে উঠে কণ্ঠস্বরে, "না, না। দেখি, চেষ্টা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কি না? আমার বরাতে থাকে ত নিশ্চয় হবে।"

অধ্যাপক বন্ধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালার টিটকারি আবার কানে গেল, "সতীমায়ের ছেলে কি না! হ্যাঁরে ছোক্‌রা, তোর বাপ কি করে রে? দেখেছিস তাকে কোনদিন?"

উত্তেজনায় ছেলেটি কেঁপে উঠে। অধ্যাপক বন্ধু হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। ছেলেটির চোখে জল। সে বলে ওঠে, "না, না, আমার বাবা নেই।"—অন্ধকারের দিকে সে ছুটে চলে যায়।

হিন্দুস্থানীটা মন্তব্য করে,—"বাবু, এর জন্মের ঠিক নেই আছে।"

ধমক দিয়ে অধ্যাপক গর্জন করে উঠেন "আভি নিকাল যাও উল্লুক, মুখ সামলে কথা কও।"

জুতো খুলে ছুটে যান অধ্যাপক হিন্দুস্থানী ফেরিওলার দিকে। তাকে ধরতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাই প্লাটফরমের উপর। অধ্যাপক জুতো ফেলে দিয়ে আমাকে টেনে তোলেন।

গুরুর দশা

সতীনাথের মেয়ে উত্তরা ডাকতে এসেছিল।

সতীনাথকে ছোটবেলা থেকেই জানি। ইদানীং বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না। উত্তরাই যোগাযোগটা বজায় রেখেছিল; ছোট মেয়ে উত্তরা। কত আর বয়স হবে? এই এগার বারো হতে পারে। আট দশ খানা বাড়ীর তফাৎ এমন কিছু নয়, তার কাছে। কত কি বলত উত্তরা; তার বাবা মা নাকি কোন এক সন্ন্যাসী-মহারাজের নিকট দীক্ষা নিয়েছেন।

উত্তরার বাবা আর মা দু'জনে হবিষ্যান্ন খায়; ছেলে মেয়েকে পর্যন্ত ছুঁতে দেয় না। এত বাচ-বিচার করে চলে তারা। আরও অনেক কথা শুনি অনেকের মুখে; কিন্তু বিশ্বাস হয় না। সেই দুর্দান্ত সর্বভুক সতীনাথ! টিফিনের সময় ডজন খানেক চপ-কাটলেট গলাধঃকরণ করেও তার তৃপ্তি হত না। শিয়ালদার আশে পাশে যে সকল রেঁস্তোরায় লোহার শিকে আধপোড়া-গোছের মাংস সাজিয়ে রাখে, সে সকল রেঁস্তোরায় রোজ টিফিনের সময় তার যাওয়া চাই। সেই আধপোড়া মাংসের কাঠি আটদশটা আর তাদের সেই মোটামোটা রুটি চারপাঁচখানা সে অনায়াসে উদরস্থ করত। আমরা সতীনাথের নাম দিয়েছিলেম সর্বভুক্।

ধর্মাধর্মের বা আচারবিচারের ধার দিয়েও সে যেতো না। সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেও ক্ষেপে উঠত সে। একদিন এক সন্ন্যাসী

তার কাছে ভিক্ষা চাইলে সতীনাথ সন্ন্যাসীর জটা ধরে ঘুরপাক খাইয়ে ছেড়েছিল। এমনি বেপরোয়া আর দুর্দান্ত ছিল সে। বাড়ীতে মা-পিসীমার জন্যেই পূজা অর্চনা প্রায়ই লেগে থাকত। ভালমন্দ খাবার লোভেই সেটা বরদাস্ত করত সতীনাথ। একদিন লক্ষ্মীপুজোয় ধ্যানমগ্ন পুরুতঠাকুরের টিকিটা পিছন থেকে কাঁচি দিয়ে কাটবার লোভ সে সম্বরণ করতে পারে নি। বারোবছরের ছেলে সতীনাথকে সেদিন পুরুতঠাকুর অভিসম্পাত করেছিলেন। সতীনাথ ঠাকুরদেবতা কিছুই মানত না, গালাগাল কিংবা অভিসম্পাত শুনবার জন্যই সে এরকম করে লোককে ক্ষেপাত। দুঃখ করতেন মা আর পিসীমা।

তারপর সংসারচক্রে পড়ে গেল সতীনাথ। মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হলেও তার মধ্যে যে এত পরিবর্তন হতে পারে ভাবি নি। আগেকার সেই বেপরোয়া ভাব অনেকটা শান্ত হলেও তার উদরাগ্নি সমানই ছিল। এই ত সেদিন জিতেন-বাবুর ছেলের ভাতে ভরপেটে বারোটা কাটলেট উদরস্থ করলে। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কি সতীনাথ, কেমন আছ ?"

সতীনাথ হেসে উত্তর দিয়েছিল, "বেশ আছি দাদা, মনে করেছি একদিন আপনার কাছে গিয়ে কোষ্ঠীটা দেখিয়ে আসব। পিসীমা রাতদিন বিরক্ত করছেন।"

"কেন ? কি হয়েছে ? তুমি ত এসব বিশ্বাস করতে না ?"

"আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি বায় আসে দাদা ? পিসীমাকে

কে নাকি বলেছে আমার এখন শনির দশা চলছে। কি জানি কখন কি হয় ?"

হেসে উত্তর দেই, "তোমার আবার ভয় ? চিরটাকাল একরকমই দেখছি। গ্রহ-টহ তোমার করবে কি ?"

সতীনাথ হোঃ হোঃ করে হেসে উত্তর দিল, "নাঃ, কিন্তু ওই বড়-ঠাকুরটার নাম শুনলে কেমন ভয় হয় দাদা। গণেশের মুণ্ডটা পর্যন্ত উড়িয়ে দিয়েছিল ওই কালো ঠাকুর ; অবিশ্যি একবার সামনাসামনি দেখা হলে দেখে নিতাম ; কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে দৃষ্টি ফেলবে, আর পোড়া কৈ মাছ পর্যন্ত হাত থেকে পালিয়ে যাবে।" তারপর আবার হোঃ হোঃ করে একচোট হেসে বলতে লাগল, "মুণ্ডটা উড়ে গেলে ক্ষতি নেই দাদা ; কিন্তু মুখটা আর উদরটা বজায় থাকলেই সতীনাথের চলবে।"

সতীনাথের কথা শুনে হাসি পায়। চির-আমুদে আমাদের সতীনাথ। পাড়ার থিয়েটারে শকুনির অভিনয় করত কর্ণার্জুনে। ইদানীং নাটকও দু'একখানা লিখেছিল। পাড়ায় দু'একবার সতীনাথের লেখা নাটকও অভিনয় হয়ে গেছে।

তারপর শুনলাম, সতীনাথ সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়েছে। সে রীতিমত জপ আহ্নিক করে ; ঘনিষ্ঠ নিমন্ত্রণ বাড়ীতেও তাকে আর দেখা যায় না। হবিষ্যান্ন করে সতীনাথ। একদিন দেখি খালি পায়ে হন্ হন্ করে চলেছে ; আশ্চর্য হই তাকে দেখে। দাড়ি গোঁফ আর কামায় না, আধ পাগলা গোছের চেহারা। উত্তরার কথা, তখন কতকটা বিশ্বাস হয়েছিল। সতীনাথকে একদিন এরকম রাস্তায় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি সতীনাথ, তোমার

দেখা পাওয়াই ভার। এ কি হয়েছে পায়ে জুতো নেই; গোঁফদাড়ি কামাও না। সত্যি তোমায় শনিতে পেয়েছে।"

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সতীনাথ বললে, "এসব বুঝবেন না দাদা, শনি আমার কি করবে? গুরু বলেছেন, মার কৃপায় যা চাও, তা-ই পাবে! শনি কি করবে তোমার? যাঁর গুরু আছে, তাঁর জীবন-ভোর গুরুর দশাই চলে, অন্যগ্রহ তার কাছে ঘেঁষতে পারে না।"

সতীনাথের গুরুভক্তির দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হই। তারপর তিনচার মাস কেটে গেছে। শুনেছি সতীনাথের বড় অসুখ করেছে। অফিসে আর বের হয় না।

উত্তরাকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন পিসীমা। তাদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে সতীনাথের অবস্থা দেখে শিউরে উঠলাম, এ কি দশা সতীনাথের। সতীনাথের স্ত্রী সরলা আমাদের সতাদার মেয়ে। বয়স আর কত হবে, সাতাশ আটাশ হতে পারে বড় জোর। সরলা নাকি স্বপ্নে গুরুর শ্রীমুখ থেকে মন্ত্র পেয়েছে। স্বয়ং মা দুর্গা তাঁকে স্বপ্নে সাক্ষাৎ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—কিছুদিন কষ্ট করে সব সয়ে যা, তোদের ভাণ্ডার সোনাদানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কোন অভাব থাকবে না তোদের।

সতীনাথ মা দুর্গার সাক্ষাৎ না পেলেও সরলার কথায় বিশ্বাস করেছে। তারপর থেকে চলেছে কৃচ্ছ্র সাধনা। দীক্ষা নিয়েছে —সেই স্বপ্নে দেখা সন্ন্যাসী মহারাজের শ্রীমুখ থেকে। সরলা বলত, "বুদ্ধদেবের কথা জান না? ছয়টি বছর কি খেয়েছিলেন তিনি?"

তিনমাস ওষুধ না খেয়ে গুরুর নাম নিয়ে রয়েছে সতীনাথ। গুরুর উপর এমনই তাদের বিশ্বাস আর ভক্তি। সর্দি কাশি—ইনফ্লুয়েঞ্জা। তাতে আবার ওষুধ খাবে কি? ঘুর ঘুর করে ঘুরেছে তারা দুজনে খালি পায়ে খালি পেটে শহরের এ মাথা থেকে ও মাথায়। গুরু উপস্থিত থাকতে গুরুকে প্রণাম না করে কি জল-স্পর্শ করা যায়? কোনদিন দু'টা তিনটাও বেজে যায়। তারপর বাড়ী ফিরে আতপান্ন বিশুদ্ধ গব্যযোগে উদরস্থ করে তারা।

মা নেই; এখন পিসীমা ম্লেচ্ছ ভাইপোর ম্লেচ্ছত্ব ঘুচেছে দেখে খুশী হলেও এত বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করেন না। ঘরের বউ এমন ঘুর ঘুর করে ভিড়ের মধ্যে মিশবে কেন? গুরু আছে ত আছে; বাড়ীতে নিয়ে আসুক না? এসব আধিখ্যেতা পিসীমার সহ্য হয় না। সনৎ আর উত্তরা সতীনাথের ছেলে আর মেয়ে—তাদের আগলেই থাকেন পিসীমা। আহা বাছাদের মুখের দিকে তাকানো যায় না। মা বাবা ছেলে মেয়ের খোঁজই করে না। কত দুঃখ করেন পিসীমা।

সতীনাথের দেহ যেন বিছানায় মিশে গেছে। বিবর্ণ চামড়ায় ঢাকা দেহখানির হাড় কটা যেন গোনা চলে। সর্দিজ্বর অবহেলা করে ঘুর ঘুর করেছে সতীনাথ। এরকম চলেছে অনেকদিন। দুএকবার বাড়াবাড়ি হলে পিসীমা শান্তি ডাক্তারকে ডেকেছিলেন। তিনি আবার আর এক মহাপুরুষের শিষ্য। অদ্ভুত তাঁর চিকিৎসা। শুধু জল দিয়ে চিকিৎসা করেন। জ্বরের ঘোরে সতীনাথ আবোলতাবোল বকছে। শান্তি ডাক্তার বললেন, মাথার গোলমাল।

মাথায় বরফ আর সবুজ রঙের শিশিতে বরফের জলের সঙ্গে হোমিওপ্যাথী ওষুধ মিশিয়ে খেতে দিলেন। দিনে তিনবার করে খেতে হবে। হোমিওপ্যাথ হলেও এই রঙের খেলা শান্তি ডাক্তারের নিজস্ব আবিষ্কার। যাক্, সতীনাথ দু'একদিন তাঁর ওষুধ খেয়ে ভালই ছিল। তারপর সরলা বললে, "কি হবে ওষুধ খেয়ে। গুরুর নাম জপলেই সব সেরে যাবে।" তবুও জ্বর মাঝে মাঝে আসে, ঘুসঘুসে জ্বর। তার উপর স্নান আর হবিষ্যান্ন চলতে থাকে।

পিসীমা বলেন, "কাল বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছিল বাবা। রাত বারোটা তখন। কাকে ডাকি আর কাকেই বা পাই? পাশের বাড়ীর নন্দবাবু ছুটে গিয়ে বড় ডাক্তার নিয়ে এলেন। তারপর বুকটুক দেখে তিনি যা বললেন শুনে আমি শিউরে উঠি। ছেলের আমার যক্ষ্মা হয়েছে।"

সরলা পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, "কি আর বলব? ওঁরা হাসপাতালে দিতে চান। এসব রোগ কি আর ওষুধে সারে? গুরুর দয়া না হলে কি আর এতদিন বেঁচে থাকতেন?"

"কি আর বলব বউমা? অতদিন আমাদের একটা খবরও দিতে হয়।"—আক্ষেপের সুরে উত্তর দেই সরলাকে।

"না, না, এমন ত কিছু হয় নি। এঁরা বিশ্বাস করবেন না। গুরু সবই সারিয়ে দেবেন। মিছামিছি আপনাদের কষ্ট দেওয়া।"—সরলার কথায় ও মনে দৃঢ়তা দেখতে পাই।

তারপর সতীনাথ চলে গেল।

ঠিক চলে যাওয়া হলো না। তাকে একরকম জোর করেই অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেওয়া হ'ল। আহা বেচারী সতীনাথ।

সতীনাথের স্ত্রী সরলা কিন্তু নিশ্চল স্থাণুর মত বসে রয়েছে তাদের গুরুদেবের ছবির সামনে। যাবার বেলা সতীনাথ বললে, "ওগো, ছেলেমেয়েদের দেখো। গুরুর উপর আর ছেড়ে দিয়ো না।"

সরলা ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিল, "যাও ভয় নেই। এইমাত্র বাবার আদেশ হয়েছে। ওই যে, তিনি তোমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন। প্রণাম কর, দেখতে পাচ্ছ না?"

সতীনাথ তার ডান হাতখানি অতি কষ্টে মাথার দিকে নিয়ে গিয়ে হাতড়াতে লাগল; মনে হল, গুরুদেবের হাতখানি সে ধরতে চায়। সরলা করুণ কণ্ঠে গাইতে লাগল,—

কৈছন কৈছন গুরুকা নাম।
যৈছন যৈছন অমৃত ধাম॥
শমন-ভয়-হর গুরুকা নাম।
ভবরোগহর অমৃত-পান॥

"ও: তুমিই চিঠি লিখেছিলে। তোমারই নাম প্রদীপ। থাক, থাক, বস এই চেয়ারটায়।"

তবু প্রণাম করে সামনে দাঁড়ায় একটি তরুণ। হ্যাঁ, তরুণই বটে। বয়স আঠারো উনিশের বেশী হবে না। কিন্তু তারুণ্য শুকিয়ে গেছে। তবুও কৈশোর-যৌবনের মায়াকাঠির স্পর্শ তাকে এড়িয়ে যায় নি। রোগা ছিপছিপে চেহারা। গোঁফের রেখা উঠেছে মুখে; চোখ দুটি বড় চঞ্চল। কপালে ও চিবুকে কাটার বড় বড় দাগ দেখা যাচ্ছে। গায়ে একটা হাফশার্ট, পরনে পায়জামা।

হাতে নিলাম তার ছক—জন্ম কুণ্ডলী। তার দেওয়া চিঠি পড়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম। চোরের চিঠি। একটি চোরের আত্ম-কাহিনী। কেমন করে অবস্থার বৈগুণ্যে ভদ্র ঘরের ভাল ছেলে সে পথে পা বাড়িয়েছে, তারই কথা। শহরতলীর কোন এক অজানা গলি থেকে চিঠি লিখেছিল সে, আমার সঙ্গে দেখা করবে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার সেই চিঠি······আমি চোর। অবস্থার দায়ে চুরি করতে শিখেছি। ভদ্র ঘরের বামুনের ছেলে। লেখাপড়া করতাম। বাবা মার্চেন্ট অফিসে চাকরী করতেন। বেশ ছিলাম আমরা,—দু'ভাই, এক বোন আর মা। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। আমাদের কাছে ছিলেন আমার কাকা আর কাকীমা। কাকাকে বাবা লেখাপড়া শিখিয়ে

বিয়ে দিয়েছিলেন ; কিন্তু তিনিও বেকার। টিউশনি করে কিছু কিছু তিনি পেতেন। তাঁরও দুটি ছেলেমেয়ে। বাবা মারা গেলেন। আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। এতদিন বাবার অফিসে চেষ্টা করেও কাকার চাকরী হয় নি। বাবা মারা গেলে সাহেব এবার ডেকে নিয়ে গিয়ে কাকাকে চাকরী দিলেন। কাকার ঘাড়ে আমাদের সংসার পড়ল কিনা ?……ধীরে ধীরে সংসারের ভোল পালটাতে লাগল। এর মধ্যে আবার ছোট ভাইটির টাইফয়েড হোল। দাদুর দেওয়া মায়ের হারমোনিয়ামটা বিক্রী হয়ে গেল। সংসার আর চলে না। ঝি চাকরকে বিদায় করে দেওয়া হোল। কাকীমার ফিটের ব্যারাম। মায়ের উপরই সব পড়ল।……

ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে তার অদৃষ্ট-লিপি পড়ছি, আর ভাবছি তার চিঠির কথা। শনি আর কেতু এতখানি করতে পারে ? আবার সেই চিঠির পংক্তিগুলি ভেসে ওঠে চোখের সামনে—

"…কাকার ছেলে-মেয়ের হাতে চকোলেট। ভাইবোন দুটি আবদার করে। চুরি করি তাদের জন্য। লুকিয়ে এটা-সেটা দেই। কাকার হাতে বাবার সেই রিষ্টওয়াচটা দেখলেই বুকটা ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠত। বাবার শখের গ্রামোফোনটা কাকার ঘরে বেজে ওঠে। লুকিয়ে গিয়ে তার কলটা বিগড়ে দিই। রেকর্ডগুলোও ভেঙ্গে দিই।…শুনেছিলাম মায়ের হারটা বাবার কাজের সময় নিরুপায় হয়ে বিক্রী করে দিয়েছিল কাকা। এক-দিন দেখি কাকীমার গলায় সে রকম একটা হার। সুযোগ বুঝে

সেটা চুরি করলাম। পিঠ চিরে রক্ত বের হোল। তবুও কবুল করিনি। কাকা আমাকে পুলিসে দিলেন।…তারপর এমনই স্বভাব হয়ে গেছে যে, সুযোগ পেলে যেখানে সেখানে চুরি করতে বাধে না।…"

ছেলেটির মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়, দুঃখও হয়। তার জন্য আমি কী করতে পারি? উপদেশ দেওয়া বৃথা; তার ছকটা দেখে বলি, "তুমি তো নিতান্ত ছেলেমানুষ বাবা, এ পথ বড় খারাপ। অন্য কোন কাজের চেষ্টা করলে পারতে।"

সলজ্জভাবে সে উত্তর দেয়, "বার-তের বছরের ছেলেকে তখন আর কাজ দেবে কে? কাকার উপর প্রতিশোধ নেবার একটা জেদ আমাকে চেপে ধরেছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, কাকা ছাড়া কি তোমাদের আপনার জন আর কেউ নেই?"

প্রদীপ বললে, "না, দাদু আগেই মারা গেছেন। এক মামা আছেন, তিনিও মাদ্রাজে।"

আমি বললাম, "মামা কী তোমাদের কোন খোঁজ-খবর নেন না?"

প্রদীপ হেসে উত্তর দেয়, "দু' একবার কিছু কিছু টাকাও পাঠিয়েছিলেন। তারপর আর কোন খবর পাইনি।"

আমি বললাম, "তোমার কাকা তাহলে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করছেন বলো।"

ক্ষোভের সঙ্গে সে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, সে আপনি বিশ্বাস করবেন না। আজ পাঁচ বছর বাবা মারা গেছেন, তিল তিল

করে আমরা এই পাঁচ বছরে মরতে বসেছি। আমার সেই কাকা, যার পাতে বসে অন্ততঃ দু'বেলা দু'গ্রাস না খেলে তাঁর কিংবা আমার পেট ভরত না, সেই কাকাই এখন আমাদের পথে বসিয়েছেন।"

এবার জিজ্ঞাসা করি, "তোমার মায়ের তা'হলে খুব কষ্ট হয় বল ?"

ক্ষোভে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে—"স্বপ্নেও ভাবিনি পণ্ডিত-মশাই, আমার মাকে এমন করে ঝি-রাঁধুনির কাজ করে কাকার সংসারে থাকতে হবে—আধ-পেটা খেয়ে।"

"—কেন, একবার তোমার বাবার অফিসের সেই সাহেবের সঙ্গে দেখা করলে পারতে।"

—"ওরে বাবা ! তা'হলে কী রক্ষে ছিল ?"

"এই পাঁচটা বছর তা'হলে কি করলে ? পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকলে ?"

"বসে থাকতে হয়নি। বাজার-হাট, ফাইফরমাস—সবই আমায় খাটতে হয়েছে। তবুও মায়ের কষ্ট ঘুচাতে পারিনি।"

"ছোট ভাই-বোনদের তা'হলে খুব কষ্ট। তাই না ?"

তার চোখে জল এল ; কাঁদ-কাঁদ সুরে সে বলল, "তারাও শুকিয়ে গেছে ; দুধের বদলে ছোট বোনটা ফেন খেয়েছে। আমরা বেড়াল-কুকুরেরও অধম পণ্ডিতমশাই !"

ছেলেটির কথা শুনে কষ্ট লাগে ; ভাবি নিজের কাছে তাদের রাখি। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাকে বলি, "আমাকে চিঠি লিখেছো, নিজে কোষ্ঠী দেখাতে এসেছ, আমি কী করতে পারি বল ?"

হতাশার সুরে প্রদীপ উত্তর দেয়, "আপনি আর কী করবেন বলুন? শুধু বলে দিন এ পথ থেকে কী কোনদিন ফিরতে পারব?"

তাকে উৎসাহিত করে বলি, "কেন পারবে না বাবা? বুদ্ধির দিক থেকে তুমি খাটো নও। লেখাপড়া যখন জান না একটা কিছু কাজ শিখে নাও।"

আকুলভাবে সে বলে, "জানেন পণ্ডিতমশাই, লেখাপড়া করার সুযোগও আমি পেয়েছিলাম, তাও হারিয়েছি নিজের দোষে।"

আমি বললাম, "সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলে?"

আক্ষেপ করে সে বলে, "হ্যাঁ, চুরির স্বভাবটা যাচ্ছে না যে! বাবা মারা যাবার বছর খানেক পরে আমার এক বন্ধুর বাবা সকল কথা শুনে তাঁর বাড়ীতে আমাকে আশ্রয় দেন। তখন কাকা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"তারপর সে সুযোগও হারালে?"

"হ্যাঁ, হারালাম। বন্ধুর ছোট বোন মাধবীর গলার হার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লাম। তবুও তারা ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু আট-নয় বছরের মেয়ে মাধবী,—তারই সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে; সেই লজ্জায় সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচি।"

"তারপর কোন কাজ শিখেছ?"

"দু'এক জায়গায় কাজ শিখতে গিয়েও টিকে থাকতে পারিনি। কেউ আর বিশ্বাস করতে পারে না। বুঝলেন না

পণ্ডিতমশাই, লোভটা সামলাতে পারিনে। যেখানেই যাই, একটা না একটা কিছু চুরি করে বসি।"

হাসি পায় তার কথায়। সান্ত্বনার কথা বলি—"চুরি করাটা অন্যায়, এ জ্ঞান যখন তোমার এসে গেছে তখন চুরি করা ছাড়তে পারবে।"

"কী বললেন ছাড়তে পারব?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে। কেতু আর শনি দশমে থেকে তোমার জীবন বিড়ম্বিত করলেও গুরুর প্রভাব রয়েছে তোমার উপর।"

"কাকার অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এখন লোভ বেড়ে গেছে পণ্ডিতমশাই! মারও খেয়েছি। এই দেখুন।"

ছেলেটি তাহার হাত-মুখ ও পিঠ দেখায়।

"প্রথম মার খাই অবাধ্যতার জন্য। স্কুলে যাবার দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে ভাতের থালা ফেলে গিয়েছিলাম; কাকা মুখের উপর গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিলেন। বাবা মারা যাবার ছয় মাসের মধ্যেই এরকম করে স্কুলের পাঠও বন্ধ হয়ে গেল।"

কষ্ট হয় তার কথা শুনে; তাকে বলি, "এখন তা'হলে কী করবে?"

মুখে তার ম্লান হাসি। সে বলে, "কাকার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছি মা আর ভাই-বোনকে বস্তির ঘরে।"

"বেশ করেছ, কিন্তু চলছে কী করে?"

"মোটরের কারখানায় কাজ শিখে সেখানে কাজও পেয়েছিলাম। মালিকটা ছিল মাতাল, হিসাবপত্র ঠিক রাখতে

প্যারত না। সেখানে থেকে কিছু চুরিও করেছিলাম। কিন্তু যেদিন জানলাম লোকটা আমায় ভালবাসে সেদিন তার কারখানা ছেড়ে চলে এলাম।"

ছেলেটির সরল আত্ম-স্বীকৃতি আমাকে মুগ্ধ করে। তাকে বললাম, "তাহলে দেখছি যারা তোমায় ভালবাসে তাদের কাছেই তুমি টিকতে পার না।"

সে হেসে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ ঠিক তাই। কেন জানেন, আমার স্বভাবটাই আমাকে মেরেছে।"

তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "বললে না যে মা আর ভাইকে নিয়ে একটা বস্তিতে ঘর নিয়েছে, এখন তাহলে কি করবে?"

সে উত্তর দেয়, "ওঃ, সেই কথা। মরিয়া হয়ে একদিন বাবার অফিসের সেই সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললাম। সাহেব বিশ্বাস করলে। আমায় করেছে ষ্টোর-কিপার। কিন্তু বড় লোভ। সামলাতে পারছিনে যে।"

তার কথায় হেসে উত্তর দিই, "সাহেবকে বলেছ তো তোমার স্বভাবের কথা।"

"হ্যাঁ বলেছি। কিন্তু সাহেব কি বলে জানেন? সে বলে, এ সব লোহা-লক্কড় যন্ত্রপাতি নিয়ে তুমি কী করবে? বিক্রী করবে না তো? শুধু লোভ? লোভ বাড়লে একটা করে লোহার টুকরো নিয়ে যেও। তাহলেই স্বভাব শুধরে যাবে।"

হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠি প্রদীপের কথা শুনে। আমিও

জোর দিয়ে বলি, "নিশ্চয়ই তোমার স্বভাব শুধরে যাবে বাবা। সাহেবটা ভাল। এ সুযোগ নষ্ট করো না।"

"তাহলে আশা দিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, গুরুর প্রভাব বাড়ছে, শুধরাবে বই কি।"

ছেলেটি প্রণাম করে চলে যায়। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে চোখ বুঁজে ভগবানকে স্মরণ করে তাকে আশীর্বাদ করি।

তার কথাই ভাবছি;—এ কী? আমার বর্ষপঞ্জীটা গেল কোথায়? এই তো টেবিলের উপর ছিল। এদিক ওদিক খুঁজি। নাঃ, তবে কী ছেলেটি?—বুঝলাম ছেলেটির স্বভাবই তাকে মেরেছে।

শেষ